সুন্নাৎ

মহম্মদই নারীদের উপর বোরখা চাপিয়েছে (সুরা ২৪.৩১)। গত ১২০০ বছর ধরে পৃথিবীতে বিরাট একটা অংশের কোটি কোটি মহিলা বোরখা না পরে কখনোই বাইরে বেরোতে পারে না। মহম্মদ যেখানে জীবন কাটিয়েছেন তার সামান্য দক্ষিণে আডেন-এ এত গরম যে জামা গায়ে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে তা ঘামে ভিজে যায়, এ গরমেও দেখেছি মহিলারা সারা শরীর, পুরো মুখ, বোরখা দিয়ে ঢেকে রাখছে, তারা যদি বোরখা পরে না বেরোত, যথাসম্ভব তাদের খুন করে ফেলা হত।

মেয়েদের সুন্নত—পুরুষদের সুন্নত (Circumcision) ও মেয়েদের সুন্নত (Clitorectomy) করা প্রসঙ্গে ইসলামি আইনে বলা হয়েছে, নারী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই নিজেদের জন্য ও তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য এটা করিয়ে নেওয়া বাধ্যতামূলক, কেউ এ ব্যাপারে অবহেলা করলে ইমাম জোর করে তার ব্যবস্থা করতে পারেন।

সিডনি মর্নিং হেরাল্ড-এর ৬ জানুয়ারি, ১৯৭০ সংখ্যায় মিশরে মেয়েদের সুন্নত করার ওপরে একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই লেখায় জানানো হয়েছে, মিশরের গ্রামগুলিতে প্রায় সব কমবয়সী মেয়েদেরই সুন্নত করে দেওয়া হয়। তারপর মন্তব্য করা হয়েছে, বাস্তবিক মেয়েদের এই সুন্নত করা তাদের খোজা করার সামিল।

বইয়ের নাম সন্ত্রাসের ইসলাম—তালাকের কোরান—লেখক মালেক তসলিম রুশীদ, প্রকাশক নার্গিস পারভিন মুর্শিদাবাদ।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

উৎসর্গ

যাঁদের হারায়ে খুঁজি

৺**প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু,** যাঁর সাথে আমার পরিচয় ১৯৪৬ থেকে—স্বাধীনতা সংগ্রামী, গত ৩০.১২.২০১১ তারিখে পরিণত বয়সে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। তিনি অবসর জীবনে হিন্দুত্বের উপর অনেক বই লিখে গেছেন যা ভাবীকালের গবেষকদের নিকট এক অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হবে। তাঁর প্রতি রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, তাঁর অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

৺**দেবজ্যোতি রায়** গত ১৮.৭.২০১৩ তারিখে অসংখ্য পাঠক পাঠিকাকে শোকসাগরে ভাসিয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে মানব সমাজের যে কি ক্ষতি হয়েছে তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। ইসলাম, কোরান হাদিসের উপর তার পাণ্ডিত্য অপরিসীম। আমাদের হিন্দুদের নিকট ১০৮ সংখ্যাটির গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা যখন দেবতাদের নাম জপ করি তখন ১০৮ বার শিবপূজার সময় তাঁর মাথায় ১০৮টি বিল্বপত্র স্থাপন করি। কোন দেবদেবীর পূজায় চরণতুলসী দিই তখনও সংখ্যা ১০৮টি, মা কালীর পায়ে যখন জবা ফুল দিই বা গলায় মালা দিই তখনও ১০৮টি। আমার দৃষ্টিতে সমগ্র পৃথিবীতে যাঁরা ইসলাম, কোরান হাদিস নিয়ে নিরপেক্ষভাবে গবেষণা করেছেন তাঁদের ১০৮ জনের জ্ঞানভাণ্ডার একত্রিত করলে যা দাঁড়াবে, দেবজ্যোতিবাবুর জ্ঞানভাণ্ডার তার থেকে অনেক বেশি বলে আমি অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলতে পারি। আমাদের হিন্দুদের দুর্ভাগ্য, এমন কোন হিন্দু সাহিত্য পরিষদ বা সংস্থা নেই যাঁরা এঁদেরকে মূল্যায়ন করে কোন পুরস্কার বা সাম্মানিক খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেন, বা আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করেন। শ্রী রায় প্রায় ২৫টি অসাধারণ গ্রন্থ এবং প্রায় ২৫/৩০টি জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন এবং ৫০টির মত হ্যাণ্ডবিল রচনা করেছেন। আমার বর্তমান বয়স ৮৫ (৪/২০১৫), আমার পক্ষে তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তবে ভাবীকালের দেশপ্রেমিক যুবকদের নিকট আমার সনির্বন্ধ আবেদন তাঁরা যেন দেবজ্যোতিবাবুর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে আসে। শ্রী রায় আমার অনুজ প্রতিম, ২/১দিন পর পরই ফোনে অনেকক্ষণ ধরে কথা হতো, তাঁকে হারিয়ে আমি দিশাহারা, খুঁজে বেড়াই যদি কোথাও কখনো একটু দেখা হয়ে যায়। তিনি যদি দেবজ্যোতি রায় না হয়ে ডেভিড জোসেফ রে হতেন এবং সাদা চামড়ার কুলে জন্মাতেন তাহলে সঠিক মূল্যায়ন হতো। ভগবানের নিকট তাঁর অমর আত্মার

চিরশান্তি কামনা করি এবং পুনরায় এই বঙ্গভূমিতে আগমনপূর্বক দেশমাতৃকার সেবায় যেন নিজেকে নিয়োজিত করেন।

৺**রাণা প্রতাপ রায়** গত ০১.১১.২০১৩ তারিখে তাঁর অগণিত গুণগ্রাহীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণ আমার নিকট বজ্রপাতসম। ৺দেবজ্যোতি রায়ের মতই তাঁর অপরিসীম পাণ্ডিত্য তাঁর গুণগ্রাহীদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। জনসাধারণ তাজমহল দেখে, তাঁর স্থাপত্য সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন এবং স্থপতিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন কিন্তু যে ভিতের উপর তাজমহল দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতি একবারও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। এখানে আমি যাঁদের নাম উল্লেখ করলাম তাঁরা হিন্দুত্বের যে ভিত তৈরি করে দিয়ে গেলেন ভাবীকালের হিন্দুত্বের পতাকাবাহীরা এঁদের কর্মধারা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে বলে আমার বিশ্বাস। ৺ রাণা প্রতাপ রায়ের অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি, ৺দেবজ্যোতি রায়ের মতো তাকেও আমি খুঁজে বেড়াই যদি কখনো কোথাও একটু দেখা হয়ে যায়।

৺**ডঃ দিনেশচন্দ্র সিংহ** আমার বাল্যবন্ধু। গত ১৬.০৬.২০১৪ তারিখে তাঁর অগণিত পাঠককে শোকসাগরে ভাসিয়ে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন। দেশ ভাগের উপর তাঁর গবেষণামূলক তথ্যভিত্তিক গ্রন্থগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশভাগের সময় প্রায় ২০ লক্ষ নিরীহ আবালবৃদ্ধ নারী খুন হয়েছেন, এক লক্ষেরও বেশি মা এবং ভগিনী ধর্ষিতা হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তিনি তাঁর নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন তার লেখা বই এবং প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। পশ্চিম পাকিস্তানে বর্বর মুসলিম লীগের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়ে অনেক লেখক অনেক বই লিখেছেন। কিন্তু সেক্যুলার বাঙালীরা অকথ্য অত্যাচারিত হয়েও তা লিপিবদ্ধ করেনি। দিনেশবাবুর বইগুলি ভাবীকালের গবেষকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ বলে পরিগণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর অমর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং উপরোক্ত দু'জনের মতো তাঁকেও আমি খুঁজে বেড়াই যদি কখনো কোথাও একটু দেখা হয়ে যায়।

মরহুম ডঃ হুমায়ুন আজাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ৬০-এর অধিক, তার মধ্যে পাক সার জমিন সাদ বাদ এবং ১০,০০০ এবং আরো ১টি ধর্ষণ এক অনবদ্য প্রকাশনা। উল্লিখিত প্রথম পুস্তকে তিনি লিখেছেন, ১৯৭১-এ মহা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা সৃষ্টি করি একটি স্বাধীন দেশ। বাংলাদেশ। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল অন্ধকারের শক্তিরাশি আমাদের সামনের দিকে এগোতে দেয়নি, বরং নিয়ে চলেছে মধ্যযুগের দিকে, বাংলাদেশকে করে তুলছে একটি অপপাকিস্তান, মৌলবাদ এখন দিকে দিকে

হিংস্ররূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে। ত্রাসে ও সন্ত্রাসে দেশকে আতঙ্কিত করে তুলেছে।

উল্লেখ্য দ্বিতীয় পুস্তকটির প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, বাংলাদেশ এখন হয়ে উঠেছে এক উপদ্রুত ভূখণ্ড, হয়ে উঠেছে ধর্ষণের এক বিশাল রঙ্গমঞ্চ, ৫৬,০০০ বর্গমাইল ব্যাপী পীড়নের এক শোচনীয় প্রেক্ষাগার, ধর্ষিতা হচ্ছে মাটি মেঘ নদী রৌদ্র জ্যোৎস্না দেশ এবং একটি নারী ধর্ষণের কাহিনী বলা হয়েছে এই উপন্যাসে। ধর্ষিতা ময়না আত্মহত্যা করেনি, অভিযোগ করেনি, সে তার অবৈধ সন্তানটিকে টুকরো টুকরো করেছে একটি ধারালো দা দিয়ে; এবং প্রতিশোধ নিয়েছে সে অন্তত একটি শুয়োরকে টুকরো টুকরো করতে পেরেছে বলে।

এই প্রকার বই লেখার অপরাধে ২০০৪ সালে বইমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার দেহ চপারের আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হয়, অবশেষে মৌলবাদীদের উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং তিনি মহান ইসলামের দুশমন হিসাবে ইন্তেকাল (মৃত্যুবরণ) করেন।

তাঁর এই বই দুটোর কিছুটা অংশ আমি আমার বই ধর্ষিতার জবানবন্দীতে তুলে দিয়েছি।

মালালার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিটা আমার কাছে একটা কাকতালীয় ব্যাপার। আমার মনে হয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে এবং মৌলবাদের আবরণ উন্মোচন করার জন্য যাদের যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৺দেবজ্যোতি রায়, ৺রাণা প্রতাপ রায় এবং বাংলাদেশের মরহুম হুমায়ুন আজাদ এবং তসলিমার নাম বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য।

এছাড়াও মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাঁরা জীবনপাত করেছেন তাঁদের মধ্যে অনাবাসী ভারতীয় ৺অরবিন্দ ঘোষ, ৺বিনয়ভূষণ ঘোষ, ৺অধ্যাপক প্রণয় বল্লভ সেন ও ৺ডঃ নরেন্দ্রলাল দত্ত বণিককে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গত প্রায় ২৫ বৎসর ধরে যারা ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅমিতাভ ঘোষ, ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, ড. রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ কৃষ্ণকান্ত সরকার, শ্রীমানিকলাল রায়, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভৌমিক, গিয়াসুদ্দিন, শ্রীমোহিত রায়, শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দাস, শ্রীনিত্যরঞ্জন দাস, ডঃ দুর্জয় চৌধুরী, পবিত্র চৌধুরী, পবিত্র রায় এবং বাংলাদেশের শাহরিয়ার কবির সালাম আজাদ এবং শ্রীরবীন্দ্র ঘোষের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রতিও রইল আমার অপরিসীম শ্রদ্ধা।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

ভূমিকা

আমার এই তথ্যবহুল বইটি আমার নিজস্ব কোন লেখা নয়; বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাংবাদিক, প্রবন্ধকার; পত্র লেখকদের লেখা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তার ওপর আমার কিছু মন্তব্য সহকারে জনসাধারণের গোচরে আনার একটা প্রয়াস মাত্র। আমার বর্তমান বয়স ৮৫ (এপ্রিল, ২০১৫) নানা ব্যস্ততার মধ্যে সময়াভাবে বইটি গুছিয়ে লিখতে পারিনি বলে আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। মুসলমান পাঠকরা বইটা পড়ে আমার ওপর রুষ্ট হতে পারেন, তবুও আমার করার কিছুই নেই। জীবনে যা সত্য বলে মনে করেছি তা বিনা দ্বিধায় জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করা কর্তব্য বলে মনে করি। ধর্মের নামে মাতা এবং ভগিনীদের ওপর বর্তমান যুগেও যে অত্যাচারের স্টিম রোলার চালানো হয় তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। যাদের ওপর এই অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হচ্ছে তারা এতই অসহায় যে প্রতিবাদ করার সাহসটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। তাদেরই বুকফাটা কান্নার প্রতিফলন হচ্ছে আমার কলমের মধ্য দিয়ে। আমার বহু পরিশ্রমের ফসল বইটা পড়ে অন্তত একজন মানুষের মনেও যদি প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে তবে মনে করবো আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

লেখকের অন্যান্য বই

(১)	শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আদবানীর নিকট খোলা পত্র	মূল্য ১০
(২)	মানবতার শত্রু ইসলাম	মূল্য ১০
(৩)	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট খোলা পত্র	মূল্য ৫
(৪)	নিঃশব্দ সন্ত্রাস	মূল্য ১৫
(৫)	ধর্ষিতার জবানবন্দী	মূল্য ২৫
(৬)	দ্বিখণ্ডিতা মাতা, ধর্ষিতা ভগিনী	মূল্য ৮
(৭)	নমোঃ নমোঃ নমোঃ	মূল্য ৪
(৮)	পূর্ববঙ্গ ও হিন্দু সমাজ বই তো নয় যেন একটি স্ফুলিঙ্গ	মূল্য ১০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

কলেজ স্কোয়ার পূর্ব

মোবাইল ঃ ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী আলকায়দা—প্রধান আয়মান আল জাওয়াহিরি, ভারতকে মহান ইসলামের সুশীতল ছত্রছায়ায় নিয়ে আসতে তার শাখা খোলার কথা ঘোষণা করেছে, তার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত করা। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, অসম এবং বিহারের পূর্ণিয়া প্রভৃতি মুসলিম প্রধান অঞ্চলকে একত্রিত করে বৃহত্তর মুসলিম বাংলাদেশ গঠন করা। শেখ মুজিবর রহমানও তাঁর জীবদ্দশায় এই মত পোষণ করতেন। অসমের খনিজ সম্পদ, বর্ধমানের কয়লা খনিগুলির দখল না নিতে পারলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব বজায় রাখাই কঠিন হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, চীন তিব্বত দখলের পর ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ বদল করে তার জল চীনের দিকে প্রবাহিত করার ফলে ভারতস্থ (অসম) অংশে ব্রহ্মপুত্র নদে বিশাল চর সৃষ্টি হয়। সেই সব চরে বাংলাদেশের মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অসমকে একটি মুসলিম প্রধান রাজ্যে পরিণত করতে বাংলাদেশের মৌলবাদী গোষ্ঠী বিশেষ সচেষ্ট। এখানে একটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। অসমের অন্তর্গত বরোল্যাণ্ড নামক যে স্থানটি আছে তাতে বরোরাই, বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। সেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৩০ জন বরো এবং ৭০ জন বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী; বর্তমানে অসম বিধানসভায় বদরউদ্দিন আজমলের দলের ১৮ জন সদস্য রয়েছে। তাদের সাহায্য ছাড়া অসমে কোন দলই সরকার গঠন করতে পারবে না। আলকায়দা নেতার এই ঘোষণার পূর্বেই স্বাধীনতার পর থেকে গত ৬৭ বৎসর (১৯৪৭-২০১৪) ইসলামি জঙ্গিদের আক্রমণে অসংখ্য হিন্দু নিহত এবং কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ার পরও ভারতের শাসকগোষ্ঠী মুসলিম ভোট হারানোর ভয়ে কোন জরুরি পদক্ষেপ নেননি। তবে একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি কয়েকজন নির্ভীক সাংবাদিক এবং প্রাবন্ধিক এই নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি আরম্ভ করেছেন। সংবাদপত্রগুলি লোকে পড়ে মাসের শেষে পুরানো সংবাদপত্র ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দেয়। তাই আমার মনে হয়েছে এ সম্বন্ধে একটা ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়া যাক।

ইতিমধ্যে আলকায়দা প্রধানের ঘোষণার পর প্রচুর সংখ্যক মুসলমান যুবক ঐ সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ভারত সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তাছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের

প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী এন. কে. নারায়ণন যিনি ভারত সরকারের একসময় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন, বলেছেন "জিহাদের নতুন সংস্করণ ছোট কিন্তু শক্তি ধারায় মজেছে ভারতীয় যুব সমাজ, জিহাদে আকৃষ্ট হচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে যুবক।

এখানে একটা কথা চিন্তা করার আছে। কিসের নেশায় হাজার হাজার মুসলিম যুবক এই বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়াচ্ছে। মানব বোমা হয়ে নিজের জীবন ধ্বংস করছে। কথাটা জলের মত পরিষ্কার, ইসলাম ধর্ম মতে ইসলামের জন্য জেহাদে যোগ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করলে বেহেস্তে (স্বর্গে) যাওয়ার পথ সুগম হবে। মহান আল্লার বেহেস্তে তারা হবেন মহা সম্মানিত অতিথি। সেখানে থাকবে স্বর্গীয় খাবার দাবার ও ফলমূল, দুধের নহর (খাল) থেকে দুধ, মধুর নহর থেকে মধু ও সুরার নহর থেকে স্বর্গীয় সুরা পেয়ে থাকেন। সেই স্বর্গবাসীর বয়স থাকবে ৩২ বৎসর পর্যন্ত, তারপর আর বয়স বাড়বে না। সেখানে প্রতিটি স্বর্গবাসী মুসলমান হাজার হাজার অপূর্ব সুন্দরী রমণী বা হুরী পাবে যারা সবসময় কুমারী থাকবে। তাদের বয়স ১৬ বছরের বেশি হবে না। আল্লাহ প্রতিটি স্বর্গবাসী মুসলমানকে অঢেল যৌন ক্ষমতা দেবেন। একজন হুরীর সাথে যৌনক্রিয়া আরম্ভ করলে তা ৪০ বৎসর স্থায়ী হবে। ইসলামি জঙ্গি শিবিরগুলিতে শিক্ষাদান কালে এইসব বক্তব্য শিক্ষার্থীদের মাথায় প্রবেশ করানোর ফলে তারা এই সব হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়। অনেকে বলেন, মুসলমানদের শিক্ষার অভাব এবং অভাবের তাড়নায় যুবকেরা জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেয়। একথা আমি মোটেই মানতে পারছি না। ওসামা বিন লাদেন একজন ধনাঢ্য এবং উচ্চশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আমেরিকার ১১ সেপ্টেম্বর ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের নায়ক আটা মহম্মদ একজন উচ্চশিক্ষিত এবং ধনীর সন্তান ছিলেন। কিন্তু ইসলামি বেহেস্তে অফুরন্ত সুরা এবং নারী ভোগের লোভেই তারা এই বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়েছেন।

গত ২০১৩ সালে বইমেলায় এক মুসলিম যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং তার সাথে ইসলাম সম্পর্কে কিছু কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তার সঙ্গে প্রথম কথাতেই বুঝতে পারলাম যে সে একজন কট্টর ইসলামপন্থী, অনেকক্ষণ আলোচনার পর তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ধরুন আপনারা পুরো ভারতবর্ষকে দারুল ইসলামে (মুসলিমশাসিত রাজ্য) পরিণত করলেন, তখন কিভাবে আপনাদের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবেন? তার উত্তর ঃ মানুষের তৈরি কোন আইনকানুন সংবিধান দণ্ডবিধি তারা মানবে না, কোরান এবং হাদিসের নিয়ম অনুসারে চলবে দেশের শাসন ব্যবস্থা। সমস্ত অধিবাসীকে ইসলাম কবুল করতে হবে। সুন্নত করাতে হবে, ইসলামি নাম রাখতে হবে। লম্বা দাড়ি রাখতে হবে, গোঁফ কামিয়ে ফেলতে হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে হবে। সমস্ত মন্দির

এবং মূর্তি ধ্বংস করতে হবে। মূর্তিপূজা করা চলবে না, মহিলাদেরকেও সুন্নত করতে হবে এবং ইসলামি পোশাক পরতে হবে। একা মহিলারা বের হতে পারবে না। বাড়ির কোন পুরুষসঙ্গী নিয়ে বের হতে হবে। অবিবাহিতদের পিতা অথবা ভ্রাতাদের, বিবাহিতারা স্বামীর অনুমতি নিয়ে, স্বামীর অবর্তমানে পুত্রের অনুমতি নিয়ে বের হতে হবে, ইত্যাদি। তখন আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, পৃথিবীতে অনেক মুসলিম রাষ্ট্রে তালিবানি শাসন চালু হয়েছে, যথা—মেয়েরা সাইকেল চালাতে পারবে না কারণ সাইকেল প্যাডেল করার ফলে তাদের যৌনাঙ্গের পেশীসমূহ অতিরিক্ত চাপের ফলে উত্তেজনাবশতঃ তাদের চরিত্রহানি হতে পারে। কোন কোন মুসলিম দেশে বোরখা পরে গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়েছে কিন্তু মেয়েদের সাইকেল চালানো নিষিদ্ধ। কোন মুসলমান মেয়ে স্বামীর সঙ্গে বোরখা পরে মোটর সাইকেলে যেতে পারবে কিন্তু দু'দিকে পা ফাঁক করে বসতে পারবে না। একদিকে পা রাখতে হবে। মেয়েদের খেলাধূলা, সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করা, কোন পুরুষ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি আরো বললাম, আপনারা হিন্দুদের পৌত্তলিক বলে ঘৃণা করেন এবং হত্যার যোগ্য মনে করেন। অথচ দেখা যাচ্ছে মক্কা শরীফে হজ্ করতে গিয়ে মুসলমানরা মস্তক মুণ্ডন করে সাদা ধুতি এবং চাদর জড়িয়ে একটা কালো পাথর চুম্বন করেন যার নাম আল হাজর আল আনোয়াদ। মালদহে কদম রসুল মসজিদে একজোড়া পাথর রাখা আছে তাকে আপনারা হজরত মহম্মদের (দঃ) পদচিহ্ন হিসাবে শ্রদ্ধা করেন। কাশ্মীরে একটা মসজিদে হজরত মহম্মদের (দঃ) একগাছা "বাল" (চুল) রাখা আছে, সেই মসজিদ হজরত বাল মসজিদ নামে খ্যাত। সেই বাল একবার হারিয়ে গেছে এমন একটা গুজবের ফলে বাংলাদেশে অসংখ্য হিন্দু হত্যা, নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ, লুঠপাট চালানো হয়েছে; এই ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাই। আপনাদের ধর্মের মূল কথা হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহা মহমুদুর রসুল আল্লা অর্থাৎ আল্লা ভিন্ন উপাস্য নেই এবং মহম্মদ (দঃ) আল্লার একমাত্র রসুল, অথচ সমগ্র পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে মুসলমানরা পীর হাফেজ মৌলানা কারীদের কবরখানায় মাজার তৈরি করে কাফের (ঘৃণিত তথা মূর্তি পূজক হিন্দু)-দের মত ধূপধুনা, ফুলের মালা এবং চাদর চড়িয়ে আল্লার পরিবর্তে এইসব মৃত পীরদের কবরের পূজা করছে এবং মানত করছে, মনোবাসনা পূর্ণ হলে সেখানে প্রচুর ধনদৌলত উপঢৌকন দিচ্ছে, এটা কি ইসলাম বিরোধী নয়? মৃত মুসলমানদের কবরের উপর ইট-পাথর দিয়ে সৌধ নির্মাণ করাও ইসলামবিরোধী—তাও করে চলছে মুসলমানরা, এইসব প্রশ্নের উপর আপনার সুচিন্তিত মতামত জানতে চাই।

উত্তরে তিনি বললেন, 'ইসলামের অত গূঢ় তথ্য জানার জন্য আপনাকে অশেষ

ধন্যবাদ তবে আমাদের কিছু গোপন এজেণ্ডা আছে, যত দিন না আমরা শক্তি সঞ্চয় করছি ততদিন আমরা এইসব ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাই না। তবে আমরা যদি সব দারুল হার্বকে (অমুসলিম শাসিত রাজ) দারুল ইসলামে (মুসলমানশাসিত রাজ) পরিণত করতে পারি তখন আমরা এই সব মাজার ইত্যাদি গুঁড়িয়ে দেবো। এইসব স্থানে কিছু মুসলমান ব্যবসা পেতে বসেছে। যেমন, খাজা মঈনুদ্দিন চিসতির দরগা, ওখানে কোটি কোটি টাকা আমদানি হয়। এটা সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী। মানত করা তাবিজ কবজ ধারণ করা, রোগ সারানোর জন্য পানি পড়া খাওয়ানো, সুদ খাওয়া কাফেরের (বিধর্মীর) অধীনে চাকুরি করা জাকাৎ না দেওয়া ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী কাজ আমরা বন্ধ করবো। তবে সেই পর্যায়ে পৌঁছতে একটু সময় নেবে, আমি আরো প্রশ্ন করলাম, গত শতাব্দীতে মক্কা শরীফের কিছু কিছু বিখ্যাত মাজার কট্টরপন্থী ইসলামিরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে, এই সংবাদ আপনি অবগত আছেন কি? তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, এই সংবাদ তার জানা আছে।

এবার আমার সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য গত ১৬.৯.২০১৪ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত শাশ্বতী ঘোষ লিখিত একটি প্রবন্ধ এখানে ছাপিয়ে দেওয়া হল যা পাঠ করে জনসাধারণ বুঝতে পারবেন ইসলামি মৌলবাদ কি ভয়ঙ্কর মানবতাবিরোধী।

মৌলবাদ, যে রঙেরই হোক, ভয়ানক

শাশ্বতী ঘোষ

আইএসআইএস সশস্ত্র জঙ্গিরা ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যাণ্ড সিরিয়া/লেভান্ত পরিচয় থেকে এখন নিজেদের অধিকৃত ইরাক আর সিরিয়ার অংশকে নাম দিয়েছে ইসলামিক স্টেট (আইএস) বা খিলাফত। ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মসুল দখল করে তারা মসুলনিবাসী পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী ও তার চেয়েও প্রাচীন জরথুস্ত্রপন্থী ইয়েজিদি সম্প্রদায়কে ফতোয়া দিয়েছে, হয় ইসলাম নয় মৃত্যু। এরপর পাহাড় মরুভূমি পেরিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের পলায়ন, অভাবনীয় হত্যাকাণ্ড, জিয়ন্তে পুঁতে ফেলার খবরের পরে একের পর এক পশ্চিমী সাংবাদিক ও সমাজকর্মীর জবাইয়ের ছবি দেখে আমরা শিউরে উঠলাম। যে কাহিনীগুলো বাইরে এল, তাতে মনে হল ইসলামকে বিশুদ্ধ করার দায়টা প্রাথমিকভাবে মেয়েদেরই নিতে হবে। তিন বছর আগে ইরাকি জনগণ স্লোগান দিয়েছিল, 'বাগদাদ কান্দাহার নয়', এ বার মসুল শহরে দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা নিনেভ কান্দাহার নয় আমাদের রক্ষা করো।'

আফগানিস্তানে কান্দাহার ছিল তালিবানের সদর দপ্তর। হুকুম জারি হয়েছিল সেখানে পুরো মুখ ঢাকা বোরখা না পরলে মেয়েদের মরতে হবে। ইয়েজিদি মেয়েরা যুদ্ধের লুঠ হিসেবে যথেচ্ছ ধর্ষিত, খ্রিস্টান মেয়েদের যৌনদাসী হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া—এই তো বিধর্মীর উপযুক্ত শাস্তি। বেড়ে গেছে শিশু 'বিবাহ'। সাত বছরের মেয়েকেও বিয়ে করে শয্যাসঙ্গী করা হচ্ছে।

আইএস অধিকৃত মসুলে মেয়ে ডাক্তারদের বলা হয়েছে, তাঁদের পুরো শরীর ঢাকা বোরখা, হাতে দস্তানা পরতেই হবে, যাতে শরীরের কোনও অংশ দেখা না যায়। মসুলের হাসপাতালে দুই ডাক্তারনি, সালওয়া মোহাজের আর আনসাম আল-হামদানি তাঁদের সোস্যাল নেটওয়ার্কে লিখেছেন, চিকিৎসকের ভীষণ অভাব। সবাই প্রায় পালিয়ে গিয়েছেন। তাঁরাও এই সব ফতোয়া মেনে ডাক্তারি করছেন, নির্ধারিত পোশাকে রোগিণীদের দেখা এবং শল্যচিকিৎসা করা সম্ভব নয় বললে বলা হয়েছে, নির্ধারিত পোশাক পরা অনেক বেশি জরুরি। মেয়েদের বিভাগে পুরুষ জঙ্গিরা সব সময় ঢুকে আসছে নজরদারি করতে। এবং এমনকি ডাক্তার ও নার্সরাও ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচেননি। জুন মাসে মসুল দখলের পরে এক সপ্তাহেই আঠারোটি ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ্যে আসে, যেখানে চারজন নিগৃহীতা ও একজনের ভাই আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

সবচেয়ে চিন্তার—মসুলে বিজ্ঞপ্তি পড়েছে, ১১ থেকে ৪৯ বছরের সব মেয়েকে 'ছুন্নত' করতে হবে। মেয়েদের ছুন্নত ব্যাপারটা আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে আর মুসলিম দেশে চালু রয়েছে। এতে মেয়েরা যাতে কখনও যৌন আনন্দ না পেতে পারেন, এবং শুধুমাত্র শৌচকার্য আর সন্তান জন্মের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াটি চালাতে পারেন, সেজন্য জন্ম থেকে সাধারণত পনেরো বছর বয়সের মধ্যে মেয়েদের যৌনাঙ্গের প্রায় সবটুকু কেটে ফেলে দেওয়া হয়। এটা সাধারণত করে নাপিত ধরনের মানুষেরা। ছুরি, কাঁচি, দাড়ি কামানোর রেজর প্রভৃতি দিয়ে। তাদের প্রায়শই কোনও প্রশিক্ষণ থাকে না। মেয়েটি রক্তক্ষরণে বা সংক্রমণে মারা যেতে পারে, বেঁচে গেলে সারা জীবন অস্বস্তি, বার বার সংক্রমণ, অসুস্থতা নিয়ে আধা জীবন- যাপন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে সারা পৃথিবীতে প্রায় বারো কোটি মেয়ে এর শিকার। মিশর আর সোমালিয়ায় প্রায় সমস্ত মেয়েদের এই ছুন্নত হয়, অন্যত্র এমনকি পশ্চিমেও কমবেশি ঘটে। এটি মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশে হলেও ইরাক বা সিরিয়া হত না। তা হলে এখন কেন? ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'এটি মেয়েদের বিপথে চালিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে।'

এই খিলাফতের রাজধানী সিরিয়ার আল রাকা শহরে মেয়েদের ইসলামি অনুশাসন পালনের জন্য তৈরি হয়েছে আল খানসা ব্রিগেড। তারা শহরের নামী

হামিদা তাহের গার্লস স্কুলে অভিযান চালিয়ে দশ ছাত্রী, দুই শিক্ষিকা ও এক সেক্রেটারিকে গ্রেপ্তার করে ছ' ঘণ্টা আটকে রাখার পর কয়েকজনকে শাস্তি হিসেবে ৩০ ঘা করে বেত মেরে তারপর ছেড়েছে—কারণ তাদের অনেকের মুখের বোরখার সামনের কাপড়টুকু ছিল খুব পাতলা আর কয়েকজন এমনভাবে ক্লিপ এঁটেছিল যাতে মুখের অনেকটা দেখা যায়। এই সব অনুশাসনের সঙ্গে বিয়ের জন্য অফিসও খোলা হয়েছে। বলা হয়েছে কুমারী মেয়েরা জিহাদিদের শয্যাসঙ্গী হয়ে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে পারে। একদিকে মেয়েরা যাতে পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটাতে পারে, তার জন্য নানা নিষেধ, এমনকি পাথর ছুড়ে মৃত্যুদণ্ড, অন্যদিকে মেয়েদের শরীরকে জেহাদিদের যথেচ্ছ ব্যবহার, মেয়েদের অধিকারে এই দ্বিবিধ হস্তক্ষেপ হয়েই চলেছে এই খিলাফতে।

দুই পশ্চিমী সাংবাদিককে যে জবাই করে, ভিডিওতে সেই জঙ্গি কথা বলছিল ব্রিটিশ উচ্চারণে। ব্যাপারটা তাৎপর্যপূর্ণ। শিশু কন্যাদের ক্ষমতায়নের জন্য এই জুলাইয়ের 'গার্ল সামিট'-এ যেখানে আমাদের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প 'গুড প্র্যাকটিস' হিসেবে বাহবা কুড়িয়েছে, সেখানে আয়োজক দেশ ব্রিটেনের মুখ্যমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন, ব্রিটেনে বছরে ১০,০০০ মেয়েকে ছুন্নত করা হয়, যদিও এটি ১৯৮৫ সালে সে দেশে নিষিদ্ধ হয়। সোমালি লেখিকা আয়ান হিরসি আলি আত্মজীবনী 'ইনফিডেল'-এ নিজের, ছোট বোনের ছুন্নতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নেদারল্যাণ্ডস-এ সমাজতন্ত্রী দলকে সেই দেশে এই প্রথার ব্যাপকতা ও তা বন্ধ করতে সরকারকে উদ্যোগ নেওয়াতে তাঁর ব্যর্থতার কথা কবুল করেছেন। কারণ সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ, যা বলে—সংখ্যালঘুর কোনও নিজস্ব প্রথা গোষ্ঠীর একাংশকে দমিয়ে রাখলেও তাতে হাত দেওয়া যাবে না।

আশির দশকে ফ্রান্স মুসলিম অভিবাসীদের একাধিক স্ত্রী আনতে চুপচাপ অনুমতি দিয়েছিল। ২০০০ সালের হিসেবে, শুধু প্যারিসেই দু' লক্ষ পরিবারে একাধিক স্ত্রী আছে। ১৯৯৫ সাল থেকে সরকার শুধুমাত্র একটি স্ত্রী ও তার সন্তানকেই বৈধ বলে স্বীকৃতি দেবে বলে ঘোষণা করে। কেন অভিবাসনের শর্ত হিসেবে প্রথমেই সেটা বলা হয়নি? বিভিন্ন পশ্চিমী দেশ, যেমন ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গোষ্ঠীর অধিকারের নামে বাল্যবিবাহ, জোর করে বিয়ে, একতরফা বিচ্ছেদ, মেয়েদের ছুন্নত, বোরখা, সম্মানের নামে হত্যা—এ সবকে 'অধিকার'-এর তকমা দিয়ে রেখেছে। মামলা হলে গোষ্ঠীর অধিকার ও সাংস্কৃতিক বহুত্বের নামে অভিযুক্তরা হালকা শাস্তি বা ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। এই বহুত্ববাদ প্রায়শ একটি গোষ্ঠীর গোঁড়া অংশটিকে লালিত ও পুষ্ট করে। এইভাবে লালিত ও পুষ্ট হয়ে আজ বহু পশ্চিমীও আইএস-এ যোগ দিতে আকৃষ্ট হয়েছে। এদের কালো

পতাকা দেখা গিয়েছে নিউ জার্সিতে, প্যারিসে।

আই এস-এর উত্থানকে শুধু শিয়া-সুন্নির বিরোধ ভাবলে চলবে না। ধর্মীয় মৌলবাদের ছড়ানো শিকড় এখনই কাটতে না শুরু করলে আমরা সবাই বিষবৃক্ষের ফল খেতে বাধ্য হব। মেয়েদের সর্বনাশ হবে সবচেয়ে বেশি, তা গেরুয়া বা সবুজ যে বৃক্ষই হোক না কেন। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ধর্মপ্রচারকদের এখনও এ সব নিয়ে টুঁ শব্দ করতে শুনিনি, এঁদের অনেকেই কিন্তু মুক্তচিন্তার শাহবাগ আন্দোলনের বিরোধিতায় জেলায় ও কলকাতায় পথে নেমেছিলেন।

মন্তব্য ঃ প্রসঙ্গত কয়েক বছর আগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটা প্রেস কনফারেন্সে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক অনাবাসী ভারতীয় চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ হলো। তিনি ইসলামি মৌলবাদের ওপর একটা ঘটনার কথা বললেন যা নিম্নরূপ।

আমেরিকার এক মফঃস্বল শহরে নাইজেরিয়ার এক নিগ্রো মুসলমান পরিবার বাস করতেন। ঐ পরিবারের দুই মেয়ে যাদের বয়স যথাক্রমে ১১ এবং ৯ একই স্কুলে পড়াশুনা করতো। বড়দিনের (X-mas) ছুটিতে তারা তাদের দেশের বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখান থেকে ফিরে এসে ১১ বৎসরের বড় বোন আবার স্কুলে যোগ দেয়। ছোট বোন অনেকদিন অনুপস্থিত থাকায় প্রিন্সিপাল একদিন ছোট বোনের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করার উত্তরে বড় বোন বলে 'ও মারা গেছে'। প্রিন্সিপাল তখন কি কারণে তার মৃত্যু হয়েছে জানতে চাইলে সে বলে তাদের দুই বোনের ছুন্নত হয়েছে এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে ছোট বোন মারা গেছে। ছুন্নত কি জিনিস খ্রিস্টান মহিলা প্রিন্সিপাল তা জানতেন না। বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন গ্রাম্য অশিক্ষিত মহিলারা ৪/৫ জন হাত পা চেপে ধরে ক্ষুরজাতীয় ধারালো ছুরি দিয়ে ভগাঙ্কুর কর্তন করে দেয়। ঐ স্থানে কোন প্রকার অবশ (লোকাল এনেস্থেসিয়া) করে দেওয়া হয় না। যন্ত্রণায় ছটফট করলেও নিস্তার নেই। সে বলে তার ঘা এখনো শুকোয়নি এবং ক্ষতস্থানে নতুন মাংস জন্মাচ্ছে এবং যার জন্য সে খুবই অস্বস্তিতে আছে। প্রিন্সিপাল তখন তাদের প্যানেলভুক্ত লেডি ডাক্তারকে কল দিয়ে তাকে স্কুলের মেডিক্যাল রুমে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে রিপোর্ট দিতে বলেন। পরীক্ষা করতে গিয়ে ছাত্রীর যৌনাঙ্গের অবস্থা দেখে লেডি ডাক্তার চিৎকার করে আঁতকে উঠলেন। বললেন, হাসপাতাল ছাড়া চিকিৎসা সম্ভব নয়। উপযুক্ত চিকিৎসা না করালে সেপটিক হয়ে এই মেয়েটিও মৃত্যুর কবলে পড়তে পারে। তারপর ছাত্রীর পিতামাতার সম্মতিক্রমে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে সুস্থ করে তোলা হয়। অতএব ভারতের যেসব সেক্যুলারপন্থী নেতা নেত্রী

আছেন আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এখন থেকে যদি তারা সজাগ না হয় শুধু ভোটের পেছনে দৌড়ান তবে তাদেরকেও এই সব বর্বরতার শিকার হতে হবে। তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

এই সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হলে Robert E. Burns-এর লেখা The Wrath of Alla বইয়ের Women and Islam চ্যাপ্টারটা পড়ে দেখতে পারেন। তার ১৪০ এবং ১৪১ পৃষ্ঠায় মহিলাদের ছুন্নতের ছবি ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বইটির প্রকাশক A. Ghosh. Huston, Texas USA. মূল্য ঃ ৯১০ টাকা।

মুসলমানরা বলেন ইসলাম নাকি নারীদের সর্বোচ্চ সম্মান এবং মুক্তি দিয়েছে। ইসলামের নামে নারীদের উপর যে নির্যাতন চলে তার খোঁজ কতজন রাখেন। কথায় কথায় তালাক, চাবুক মারা, মাটিতে গর্ত করে কোমর সমান গর্তে পুরে পাথর ছুড়ে মারার মত অমানবিক কাজ বর্তমান যুগেও চলছে মুসলিম দুনিয়ায়।

আমাদেরও অনেক বর্বর প্রথা ছিল যথা—সতীদাহ প্রথা, গঙ্গায় প্রথম সন্তান বিসর্জন দেওয়া, বৃদ্ধ পিতামাতার স্বর্গ লাভের আশায় ভেলাতে করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া, ৫/৬ বছরের শিশু কন্যা বিধবা হলে তাকে সারা জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা, বৃদ্ধ পুরুষের সঙ্গে শিশু কন্যাকে বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি। কিন্তু আমরা সে সব বর্বরতা বর্জন করেছি। কিন্তু মুসলমানরা ১৪০০ বছরের পুরানো আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার কোন চেষ্টাই করেনি। বিশদ জানতে হলে জাহানারা বেগম লিখিত "আল্লা আমাদের কাঁদতে দাও" এবং গিয়াসুদ্দিন লিখিত প্রসঙ্গ "মুসলমান সমাজে সংস্কার" বইটা পড়ে দেখতে পারেন, মূল্য যথাক্রমে ৫ টাকা, ২০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র; ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩ (কলেজ স্ট্রিট)। এখানে উল্লেখ্য যে বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর পর তাঁকে মুসলমানরা তাদের কবরখানায় কবর দিতে দেয়নি; তাঁর অপরাধ তিনি মুসলমান মেয়েদের জন্য কলকাতায় স্কুল খুলেছিলেন। তাঁর নামাজেই জানা যায় উপস্থিত অবিভক্ত বাংলায় প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক সহ বহু বিশিষ্ট মুসলমান যথা ডাক্তার উকিল অধ্যাপক, শিক্ষক প্রভৃতি শত চেষ্টা করেও তাঁকে মুসলমানদের কবরখানায় কবর দেওয়া যায়নি। পরে গোপনে পানিহাটিতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর যদি মুসলমান সমাজে জন্মাতেন তবে খুন হয়ে যেতেন।

এবার আমার অনুজপ্রতিম বিশ্ববিখ্যাত ইসলাম গবেষক এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা ৺দেবজ্যোতি রায়ের লেখা "ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি" বই থেকে নারী-পুরুষের খৎনা অধ্যায়টি তুলে দেওয়া হলো পৃষ্ঠা ২৬ এবং ২৭।

নারী-পুরুষের খৎনা
(ইসলামের আর একটি স্তম্ভ)

খৎনা বলতে বুঝায় পুরুষের লিঙ্গের সামনের দিকের চামড়ার কিছু অংশ কেটে ফেলা এবং মহিলাদের ভগাঙ্কুরের একটুখানি কেটে ফেলা। ইসলাম ধর্মে এটি একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া। কেউ কেউ বলেন—এই প্রক্রিয়াটি বিজ্ঞানসম্মত। কোনো কোনো দেশে এটি কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য করণীয় প্রক্রিয়া। আবার কোথাও কোথাও এটি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য আবশ্যিক। এই প্রথা ইসলামপূর্ব আরবের। নবীজী এই প্রথা বহাল রেখেছেন। মহিলাদের খৎনা সম্পর্কে নবীজী বলেছেন, অল্প করে কাটো, বেশি কেটোনা (সহি আবু দাউদ, হাদিস নং-৫২৫১)। আমরা ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশের বাগেরহাটে একজন মাওলানার সন্ধান পেয়েছিলাম, যিনি নারী পুরুষ উভয়ের জন্য 'খৎনা' আবশ্যিক বলে মনে করেন।

মুসলিম দুনিয়ার বহু দেশেরই 'নারী-খৎনা' নামের এই বীভৎস, বর্বরোচিত প্রথা দেখা যায়। এই প্রথা যে মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক ছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রথা পুরুষকে মানুষ থেকে শয়তানে পরিণত করেছে, আর নারীকে পরিণত করেছে পশুর অধম জীবে।

আজ মহিলাদের 'খৎনা' বিশেষভাবে প্রচলিত আছে ঘানা, গিনি, সোমালিয়া, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, নাইজিরিয়া, মিশর, সুদানসহ উপসাগরীয় বিভিন্ন দেশে। এইসব দেশে নারীদের যৌন কামনাকে অবদমিত করে যৌন-আবেগহীন যৌন-যন্ত্র করে রাখতে পুরুষশাসিত সমাজ বালিকাদের ভগাঙ্কুর কেটে ফেলে। নারীর যৌন আবেগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যোনির প্রবেশ মুখে পাপড়ির মতো বিকশিত ভগাঙ্কুর। নারীদের খৎনা করা হয় ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার আগে অর্থাৎ সাধারণভাবে সাত-আট বছর বয়সে। খৎনা যারা করে তাদের বলা হয় 'হাজামী'। দু'জন নারী শক্ত করে টেনে ধরে বালিকার দুই উরু। দুই নারী চেপে ধরে বালিকার দুই হাত। 'হাজামী' ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে ভগাঙ্কুর। এই সময় উপস্থিত নারীরা সুর করে গাইতে থাকেন, "আল্লা মহান, মহম্মদ তার নবী; আল্লা আমাদের দূরে রাখুক সমস্ত পাপ থেকে।" পুরুষ শাসিত সমাজ ওইসব অঞ্চলের মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই বিশ্বাসের বীজ রোপণ করেছে, কাম নারীদের পাপ, পুরুষদের পুণ্য। খৎনার পর সেলাই করে দেওয়া হয় ঋতুস্রাবের জন্য সামান্য ফাঁক রেখে যোনিমুখ। খোলা থাকে মূত্রমুখ। খৎনার পর চল্লিশ দিন পর্যন্ত বালিকার দুই উরুকে একত্রিত করে বেঁধে রাখা হয়, স্বামীর কামকে তৃপ্ত করার জন্য। আবারও বলি স্বামীর কামকে তৃপ্ত করার জন্যই; কারণ নারীর কাম তো ওরা

পাপ বলে চিহ্নিত করে নারীকে করতে চেয়েছে কাম-গন্ধহীন যৌন-অস্ত্র। সন্তান প্রসবের সময় সেলাই আরও কাটা হয়। প্রসব শেষে আবার সেলাই। তালাক পেলে বা বিধবা হলে আবার নতুন করে সেলাই পড়ে ঋতুস্রাবের সামান্য ফাঁক রেখে। আবার বিয়ে, আবার কেটে ফাঁক করা হয় যোনি। জন্তুর চেয়েও অবহেলা ও লাঞ্ছনা মানুষকে যে বিধান দেয়, সে বিধান কখনও মানুষের বিধান হতে পারে না। এ তো শুধু নারীর অপমান নয়, নারীর অবমাননা নয়, এ মনুষ্যত্বের অবমাননা।

এবার আমার লেখা নিঃশব্দ সন্ত্রাস বই-এর ছুন্নৎ নামক অংশটুকু এখানে তুলে দেওয়া হল। এটা সর্বজনবিদিত যে মুসলমান ছেলেদের ৭/৮ বছর বয়সে খৎনা (ছুন্নত) যৌনাঙ্গের ত্বকচ্ছেদ করা হয়। কোন কোন মুসলিম দেশে অশিক্ষিত গ্রাম্য মহিলা দ্বারা ৭/৮ বছরের মেয়েদেরকেও খৎনা করার প্রথার প্রচলন আছে। ফলে অনেক মেয়েই অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে অথবা সেপটিক হয়ে মারা যায়। এই সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি "মুসলমান মেয়েদের ভগাঙ্কুর কর্তন ও তিনবার তালাক উচ্চারণে বিবাহ বিচ্ছেদের বিধানকে আমি বর্বরোচিত মনে করি।"

শুধু ইজরায়েলি আগ্রাসন নয়, ইসলামি সন্ত্রাসবাদ গভীরভাবে মোকাবিলার সময় এসে গেছে

সমীরণ মজুমদার

গত ৭.৯.২০১৪ তারিখের দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামে একটা বিশাল প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। সময়োপযোগী এই প্রকার অগ্নিগর্ভ প্রবন্ধ লেখার জন্য লেখক এবং ছাপাবার জন্য দৈনিক স্টেটসম্যানকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

এবার ঐ প্রবন্ধের কিছু অংশ জনসাধারণের অবগতির জন্য নিবেদন করছি—

ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষে প্রতিদিন যত মানুষ নিহত হচ্ছে, তার থেকে অনেক বেশি মানুষ প্রতিদিন নিহত ও আহত হচ্ছে ইসলামি সন্ত্রাসবাদী হামলায়। তাতে এখন প্রধানত নিহত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের মানুষ—সিয়া ও সুন্নি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে সোচ্চারভাবে লাগাতার প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না কোনও দলকে। কোন মানবতাবাদী সংঘকে, নানা মুসলমান সংস্থাকেও ইমামের খুদবাতেও প্রতিবাদ করতে শোনা যায় না। তবে কি ইজরাইলের হাতে মৃত্যু অমানবিক? আর ইসলামি সন্ত্রাসবাদীর হাতে মৃত্যু নয়? ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ সাময়িক, ইসলামি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দীর্ঘস্থায়ী, ইজরায়েল হামাস সংঘর্ষ রাজনৈতিক, তা উভয়ের সমঝোতায় থেমে যাবে। কিন্তু ইসলামি সন্ত্রাসবাদ হিংসা, ধর্মান্ধতা প্ররোচিত, তা

মানবিক বিশ্বের উদ্যোগেও থামবে না। সমাজের পক্ষে উত্তরোত্তর বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে, এতদিন ভারতে নানা প্রকার সন্ত্রাসবাদী হামলার চেষ্টা চলে আসছে, এখন জেহাদী হবার সরাসরি আহ্বান রাখা হচ্ছে ভারতের মুসলমানদের কাছে, টুইটার, ফেসবুকে সাড়া দেওয়ার প্রবণতাও দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি আফ্রিকার নাইজেরিয়াতে বোকো হারাম দল যেভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অপহরণ করে ধর্মান্তরিত করা, বিয়ে করা, বিক্রি করার মতো অমানবিক কাজ করেছে তা দেখে মানব সভ্যতা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। তারা পরে আবারও যেন কয়েকজন মহিলাকে অপহরণ করেছে। তাদের ভাগ্য অনুমেয়। এই সংস্থার নেতা আবুবকর শেকাও ভিডিও রেকর্ডিং করে জানিয়েছে, আমি আল্লার হুকুমে এই কাজ করেছি। পাকিস্তানে কয়েক বছর আগে মেয়েদের পড়াশোনার কথা বলার জন্য তালিবানরা মালালার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করেছিল, এই তালিবানরাও আল্লার রাজত্ব স্থাপনের জন্যই উদ্যোগী। এরা ফতোয়া জারি করে কাফেরনিধন ও ধর্মান্তর ঘোষণা করেছে। মুসলমান প্রধান দেশে জিজিয়া কর প্রবর্তনের আহ্বান জানিয়েছে, এইভাবে ইসলামি ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ মানব সভ্যতার চাকাকে পিছিয়ে দেবার পথ রচনা করেছে। এই জিহাদি কাজে যোগ দিতে ভারত থেকে কয়েকজন মুসলমান যুবককে যেতে দেখা গিয়েছে, শ্বাসরুদ্ধ করে একজন নারীকে হত্যা করার সময় আল্লা হু আকবর বলে ধ্বনি দেওয়ার দৃশ্য প্রচার করেছে। তারা ঘোষণা করেছে সিয়া ও খ্রিস্টান নারীদের ধর্ষণ করা বৈধ। পাদ্রীদের ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা যাবে। নারীদের জোর করে বিবাহ করে তালাক দিয়ে অন্য আর একজনকে নিকাহ করছে, একইভাবে তালাক দেওয়ার জন্য। এইরকম বিকৃত ভোগ ব্যবস্থার নাম দিয়েছে জিহাদুন-নিকাহ বা যৌন জিহাদ....কার্যত মধ্যপ্রাচ্যকে এই ইসলামি সন্ত্রাসবাদীরা খ্রিস্টান মুক্ত করার জন্য তাদের ধরে ধরে হত্যা করতে শুরু করেছে। ভয়ে অনেক খ্রিস্টান ইতিমধ্যেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সামগ্রিকভাবে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ বিশ্বের কাছে বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে। তাদের জন্য দেশে দেশে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হচ্ছে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিতে। কিছু কিছু মুসলমান অবশ্য আইএসআইএসকে ওয়াহাবি তকফিরি সন্ত্রাসী বলে মুসলমানদের প্রধান ধারা থেকে বাইরে বলে চিহ্নিত করেছে। কারণ স্বঘোষিত খলিফা আবুবকর আল বাগদাদি গোঁড়ামিতে এতদূর অগ্রসর হয়েছেন যে, কাবা শরিফ উড়িয়ে দেওয়ার কথা পর্যন্ত বলছেন। সেখানে স্থাপিত পাথরকে হজ যাত্রীরা চুমু খায় বলে এতে পাথর পূজার পাপ হচ্ছে বলে মনে করা হয়। এই ঘোষণার জন্য সুন্নি সম্প্রদায়ের অনেকে আইএসআইএসকে সুন্নি মুসলমান বলে মানতে চায় না, সিয়া ইরান তাদের খারিজি সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেছে।

আসলে ইসলাম জন্মলগ্ন থেকেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত। তার ফলে ইসলামে অর্ধশতাধিক উপদল। আর ধর্ম সংহিতায় জিহাদ নামক হিংসা 'কর্তব্য' বলে বিবেচিত হওয়ায় সংঘর্ষ প্রতিস্থাপন করছে শান্তিকে। সমস্ত অমানুষিক আচরণই জিহাদ আর আল্লার নির্দেশ বলে মান্য হয়েছে। ....সেই ধারা যে আইএসআইএস-এর মতো সংস্থার জন্ম দিতে পারে যারা কাবাকেও আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করতে পারে তা ভাবতেও পারেননি। মুসলমানপ্রধান দেশে অমুসলমানদের বসবাস অসম্ভব করে তোলে, ইসলাম এখনও বোরখা আর তালাকের মতো বিচিত্র প্রথা ইসলামের পরিচয়বোধক ধারা বলে পালন করে চলেছে। নারীর কর্মজীবন অধ্যয়নের অধিকার সঙ্কীর্ণ করে রেখেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বহু দেশে মুসলমান মনকে মুক্ত চিন্তার জগৎ থেকে নির্বাসিত করে রেখেছে। ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, নবীর যে কোন সমালোচনাকে ব্লাসফেমি বলে হত্যার বিধান দিচ্ছে। ...ইসলামে ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদী দলের আবির্ভাব রুখতে না পারলে একদিকে প্রাথমিকভাবে বিপন্ন হবে ইসলাম। আর বৃহত্তরভাবে বিপন্ন হবে বিশ্ব; কাজেই এই সভ্যতা বিরোধী সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা পৃথিবীর এক যৌথ দায়িত্ব। বিচিত্র গঠন ও বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভারত এই পরিস্থিতিতে এক শঙ্কুর উপর অবস্থান করছে, পাক-ভারত-বাংলাদেশের দেড়শ কোটি মানুষের যৌথ সঙ্ঘবদ্ধ সাহসী উদ্যোগ বিশ্বের এই ভয়ঙ্কর বিপদের অবসানে বিরাট ভূমিকা নিতে পারে।

ইসলামের সংস্কারের প্রয়োজন নেই

মঃ নুরুল ইসলাম খান

ফুরফুরা দরবার শরিফ, হুগলি

সমীরণ মজুমদারের প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর গত ১৬.৯.২০১৪ তারিখের দৈনিক স্টেটসম্যানে মঃ নুরুল ইসলাম খান-এর এক প্রতিবাদ পত্র ছাপা হয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন "আশরাফুল রিজকিল্লাহ ফালাতাশাও ফিল আরদে খুরসেদি।" পবিত্র কোরান শরিফের সুরা বাকারায় ৭নং আয়াতের অর্থ হল, "আল্লাহর নিরামত থেকে পানাহার কর, পৃথিবীতে সন্ত্রাস ছড়িয়ো না, সত্যি কথা বলতে কি সন্ত্রাসবাদ নামক ভয়ঙ্কর প্রক্রিয়া পৃথিবীতে জাঁকিয়ে বসেছে। ইসলাম যে সন্ত্রাসকে পছন্দ করে না সে প্রমাণ আগেই পাওয়া গেল। তবুও ইসলামকে সন্ত্রাসবাদের কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। জঙ্গী, উগ্রবাদী ও সন্ত্রাসবাদী বিশেষণগুলো মুসলমানদের উপর কিছুটা চেপে বসেছে।" এরপর পুরো পত্রটি পড়লে মনে হয় ইসলাম একটা নিরীহ অহিংসায় বিশ্বাসী শান্তির ধর্ম। নরেন্দ্র মোদীর আদ্যশ্রাদ্ধ থেকে আরম্ভ করে সমগ্র বিশ্বে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর নিরীহ মুসলমানদের

ওপর আগ্রাসনের দায় চাপিয়ে দিয়েছেন। তবে, কোরান শরীফে কিছু কিছু ভাল কথা লেখা আছে যাকে মাক্কি আয়াত বলে। মুসলমানরা বিধর্মীদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য এগুলো বিশেষভাবে প্রচার করে। কোনো দেশে বা অঞ্চলে মুসলমানরা যতদিন সংখ্যালঘু থাকে ততদিন তারা শুধু মাক্কি আয়াতগুলো বলে সংখ্যাগুরুদের প্রতারিত করতে থাকে। যেই মুহূর্তে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে যায় সেই মুহূর্তেই মাক্কি আয়াতগুলি ফেলে দিয়ে জিহাদের মাদানি আয়াতগুলোর প্রচার করতে থাকে।

এবার মাদানি আয়াতগুলির কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ মাণির রাহীম

সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে আল্লাহর বাণী পৃথিবীতে তার শেষ নবী (প্রতিনিধি) মহম্মদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। এই দিব্য বাণীর সঙ্কলিত রূপই হল পবিত্র কোরান। ইসলাম, আল্লাহ প্রবর্তিত একমাত্র সত্য ধর্ম। যারা আল্লাহ ও মহম্মদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস স্থাপন করে তারা হল মুসলমান। অন্য সকলে হল অবিশ্বাসী, অংশীবাদী, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও কাফের। মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ্ পরম কারুণিক কিন্তু অ-মুসলমানদের প্রতি তিনি নির্মম, কঠোর ও ভয়ঙ্কর।

সুরা (অধ্যায়) আয়াত (একটি পূর্ণ বাক্যে) কোরানের বাণী পড়ুন—

১. নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর একমাত্র ধর্ম। সুরা ৩...আয়াত ১৯।

২. নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে অবিশ্বাসীদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাকবে। যেখানে পাবে তাদের অবরোধ করবে। বধ করবে। বন্দী করবে। ৯...৫।

৩. (এই মূর্তিপূজক) কাফেরদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে—যতদিন না কাফের ধ্বংস করে সারা পৃথিবীতে খোদাহী ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। ২....১৯৩।

৪. আল্লাহ্ ও তার রসুলে (মহম্মদ) যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করব। এদের স্কন্ধে ও সর্বাঙ্গে আঘাত কর। এদের জন্য রয়েছে নরক যন্ত্রণা। ৮....১২....১৫।

৫. অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার উপর ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি—যাতে ওদের গায়ের চামড়া এবং উদরে যা আছে তা গলে যাবে। ওদের জন্য সেখানে থাকবে লৌহ মুদ্গর। যখনই ওরা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বেরুতে চাইবে তখনই তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে, ওদের—বলা হবে 'আস্বাদ কর দহন যন্ত্রণা'। ২২...১৯-২২।

৬. আল্লাহ্ সত্যধর্মসহ মহম্মদকে প্রেরণ করেছেন অন্য সকল ধর্মের উপর এসে

জয়যুক্ত করার জন্য। মহম্মদ সহচরগণ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি কঠোর। ৪৮....২৮-২৯।

৭. তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের উপাসনা কর সেগুলি তো জাহান্নামের ইন্ধন, তোমরাই ওতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। ২১-২৯, ৯৮-৯৯।

৮. যারা আমার (কোরানের) আয়াত অবিশ্বাস করে তাদের আগুনে দগ্ধ করবই। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখনই ওর স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব—যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে। ৪....৫১।

৯. হে বিশ্বাসীন। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তোমাদের হাতে আল্লাহ্ ওদের শাস্তি দেবেন, তোমাদের ওদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। ৯-১৪।

১০. হে নবী। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও কপটচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর এবং ওদের প্রতি কঠোর হও। জাহান্নাম ওদের আশ্রয়স্থল। ৬৬-৯।

১১. অভিযানে বের হয়ে পড় লঘু রণসম্ভারে হোক অথবা গুরু রণসম্ভারে হোক এবং তোমাদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম কর। বস্তুত যে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে সে নিহত হোক অথবা বিজয়ী হোক তাকে আমি শীঘ্রই মহাপুরস্কার দান করব। তার স্থান হবে জান্নাতে (স্বর্গে)। তাদের পরিবেশন করা হবে অফুরন্ত ভোগের সামগ্রী ও সুরা। অনন্ত যৌবনা, লজ্জা-নম্র, আয়ত লোচনা, সুরক্ষিত ডিম্বের মত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দরী তন্বীগণ হবে তাদের সঙ্গিনী। ৪-৭৪, ৯-৪১, ৪৭-৪, ৩৭...৪০-৫০।

১২. অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামে ভয়ঙ্কর শাস্তির ব্যবস্থা। ওদের গায়ে ঢেলে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি—খেতে দেওয়া হবে পুঁজ-রক্ত। ৩৮..... ৫৫-৫৭।

১৩. যারা অবিশ্বাস করে, তাদের ধনৈশ্বর্য ও সন্তান সন্ততিগণ সকলেই হবে নরকের ইন্ধন। ৩...১০

১৪. হে বিশ্বাসীগণ। তোমাদের পিতা ও ভাই যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে (অন্য ধর্মকে) শ্রেয় জ্ঞান করে তবে ওদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। ৯...২৩।

১৫. হে নবী। বিশ্বাসীদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ 'কর' তোমাদের মধ্যে ১০০ জন ধৈর্যশীল থাকলে ১০০০ জন অবিশ্বাসীর উপর বিজয়ী হবে। ৮....৬৫

১৬. আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমরা হবে যুদ্ধে অর্জিত বিপুল সম্পদের অধিকারী। ৪৮....২০

১৭. যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর ও আল্লাহকে ভয় কর। ৮....৬৯

সাচার কমিটি নয়, প্রয়োজন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

লেখাটি শুরু করা যাক রামকুমার ওহরির পরিচয় দিয়ে। রামকুমার ওহরি একজন প্রাক্তন আইপিএস। কর্মজীবনে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ অলঙ্কৃত করেছেন। অরুণাচল প্রদেশে ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিসের দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। সিআরপিএফের ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি আকাডেমি এবং ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্টের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। শ্রীওহরি সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। বলেছেন, ভারতের মতো একটি দেশে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য সাচার কমিটির মতো একটি কমিটি গঠন অযৌক্তিক। শ্রীওহরির এই বক্তব্য এদেশের তথাকথিত সেকুলারপন্থীদের যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করবে। এহেন বক্তব্যের জন্য ওহরিকে তাঁরা 'হিন্দু সাম্প্রদায়িক' এমন তকমা দিতে পারেন। হয়তো দিচ্ছেনও। কিন্তু ওহরি তাঁর বক্তব্যের পক্ষে যেসব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন—সেগুলি খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, খুব একটা ভুল ওহরি বলছেন না। পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দূরে সরিয়ে রেখে এখন হয়তো সত্যিই ভাবার সময় এসেছে, সাচার কমিটি গঠন কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল। আগেও একাধিকবার লিখেছি এবং এখনও লেখার শুরুতেই আরও একবার বলে নেওয়া দরকার, এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে এখন আর নিতান্ত হীনবল সংখ্যালঘু ভাবা ভুল হবে। বরং রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রভাবের দিক দিয়ে আজ তারা যথেষ্ট শক্তিশালী। এদেশের সংসদীয় রাজনীতির অনেক গতিপ্রকৃতিও তারা এখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেদিক দিয়ে দেখলে তাদের 'দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু' বলা বাঞ্ছনীয়। এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভিতর খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রমুখও পড়ে। তাঁদের আর্থ-সামাজিক- সাংস্কৃতিক অবস্থা খতিয়ে দেখতে কোনও কমিটি গঠনের কথা কেউ কখনও ভাবেননি। না ভাবার কারণ এই হয়তো যে, দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু মুসলমানরা এদেশের ভোটের রাজনীতিতে যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈনরা তা পারে না। কাজেই মুখে যাই বলা হোক না কেন, সাচার কমিটি গঠনের পিছনে গোপন উদ্দেশ্য যে ছিল দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুদের তোষণ করা—এরকম একটি সন্দেহ কিন্তু থেকেই যায়।

সাচার কমিটির বিচার্য মূল বিষয়টি ছিল—এদেশের মুসলমান সমাজ আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে কতটা বঞ্চিত এবং অবহেলিত। এটি করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের সঙ্গে এই দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু

সমাজটির একটি তুলনামূলক বিচার করতে হয়। সে বিচার করলে কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে একেবারেই বঞ্চিত বা অবহেলিত বলা যাবে না। রামকুমার ওহরি তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন, যেসব মাপকাঠিতে একটি সম্প্রদায়কে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বলা হয়, সেইসব মাপকাঠিতে বিচার করলে দেখা যাবে, এই দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বেশ কিছু ক্ষেত্রেই হিন্দু সম্প্রদায়ের থেকে উন্নত অবস্থাতেই রয়েছে। যেমন—শিশুমৃত্যু। আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত তত্ত্ব অনুযায়ীই শিশু মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার মূল কারণ অপুষ্টি এবং দারিদ্র্য। যে সমাজে দারিদ্র্য যত বেশি, সে সমাজে শিশুমৃত্যুর হারও তত বেশি। ১৯৯১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতি এক হাজার হিন্দুদের ভিতর একবছর বয়সের কম শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ৭৪। অপরদিকে মুসলমানদের ভিতর সে হার ৬৮। ওই একই সময়ে শিশুমৃত্যুর (এক বছর বয়সের ঊর্ধ্বে) সংখ্যা হিন্দুদের ভিতর ৯৭, মুসলমানদের ভিতর ৯১। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সমীক্ষা (১৯৯২-৯৩) অনুযায়ী প্রতি এক হাজারে এক বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যে ৯০ এবং মুসলমানদের ভিতর ৭৭। অপরদিকে এই সময়ে এক বছরের ঊর্ধ্বে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হিন্দুদের ভিতর ১২৪, মুসলমানদের ভিতর ১০৬। ১৯৯৮-৯৯'এ এদের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এক বছরের কম শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হিন্দুদের ভিতর ৭৭, মুসলমানদের ভিতর ৫৯। এক বছরের বেশি বয়সী শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হিন্দুদের ভিতর ১০৭, মুসলমানদের ভিতর ৮৩। তাহলে, আন্তর্জাতিক তত্ত্ব অনুযায়ীই এটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, হিন্দুসমাজে দারিদ্র্য বেশি। সে কারণেই অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুমৃত্যুর হারও বেশি। কাজে কাজেই, কথায় কথায় মুসলমান সমাজের দারিদ্র্যের যে চিত্রটি সেকুলারপন্থীরা সবসময় তুলে ধরতে চেষ্টা করেন, তা হয়তো ঠিক নয়। হয়তো তা কিছুটা অতিরঞ্জিতই।

রামকুমার ওহরি তথ্যসহ আরও দাবি করেছেন যে—শিশুমৃত্যুর হারে এই ফারাক ১৯৯১-১৯৯৯'র ভিতর আরও বেড়ে গিয়েছে। তার কারণ এই সময়ের ভিতর কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যাপকভাবে মার খেয়েছে এবং তার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মূলত হিন্দু সমাজের কৃষিজীবী অংশ। ১৫ হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছেন—যার গরিষ্ঠাংশই হিন্দু।

আন্তর্জাতিক স্তরে সমাজের আর্থিক উন্নয়ন আর একটি সূচকে মাপা হয়। তা হল, সেই সমাজের কত শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন আর কত শতাংশ মানুষ শহরে বাস করেন। যে সমাজের গরিষ্ঠাংশ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বাস করেন, সেই সমাজ অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে রয়েছে—আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে তেমনই ধরা হয়। ২০০১-এর জনগণনা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, হিন্দু জনগোষ্ঠীর ৭৪ শতাংশ গ্রামে বাস করেন। আর মুসলমান সমাজের ৬৪ শতাংশ বাস করেন গ্রামে। এই

মাপকাঠিতে দেখলেও বলতে হয়—আর্থিকভাবে মুসলিম সমাজ হিন্দুদের থেকে পিছিয়ে রয়েছে—এমন ধারণা বোধহয় ধোপে টেকে না। একটি সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নতির আর একটি মাপকাঠি হল, সেই সমাজের মানুষের গড় আয়ু কত। গড় আয়ু বেশি হলে ধরে নিতে হয় সেই সমাজের মানুষের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। পি এন মারি ভাট এবং এ. জে. ফ্রান্সিস জেভিয়ার ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলিতে (জানুয়ারি ২৯, ২০০৫) তাঁদের কথা একটি সমীক্ষায় দেখিয়েছেন—হিন্দুদের গড় আয়ু ৬১.৪। অপরদিকে মুসলিমদের গড় আয়ু ৬২.৬। ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভের একটি সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, দেশের দরিদ্রতম অংশ, যাদের দৈনিক আয় ৯ টাকা, তাদের শতকরা হার ১০। এরা মূলত গ্রামাঞ্চলেই বাস করে। এই দরিদ্রতম অংশের ৭৪ শতাংশই হল হিন্দু। মুসলমান নয়। মুসলমানরাই দরিদ্রতম, এ দাবিও বোধহয় এরপর করা সঙ্গত নয়।

তথাকথিত সেকুলারপন্থীদের আর একটি বক্তব্যও, সরকারি তথ্য অনুযায়ী সমর্থন লাভ করে না। মুসলমান সমাজে সাক্ষরের হার এখনও যথেষ্ট কম—এ যুক্তিটিও ২০০১-এর জনগণনা রিপোর্টে দেওয়া তথ্য বিচার করলে মেনে নেওয়া যায় না। বরং বলা যায়, সাক্ষরের হারের বিচারে হিন্দু সমাজের থেকে মুসলমান সমাজ এখন সামান্যই পিছিয়ে। ২০০১-এর জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী হিন্দু সমাজে সাক্ষরের হার ৬৫.১ শতাংশ। অপরদিকে মুসলিম সমাজে তা ৫৯.১ শতাংশ। জনগণনা রিপোর্টেই দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিসহ অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পুদুচেরি, দমন-দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলিতে হিন্দু মেয়েদের তুলনায় মুসলিম মেয়েদের ভিতর সাক্ষরতার হার বেশি। কাজেই, তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা যে দাবি করেন, এদেশে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুরা অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত—তাও বোধহয় সঠিক নয়।

এই মাপকাঠিতে বিচার করলে, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, তাহলে সাচার কমিটি গঠন কেন? কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসলে সাচার কমিটি গঠন করা হয়েছিল? আর সরকারেরই দেওয়া বিভিন্ন তথ্য থেকে যখন প্রমাণিত হচ্ছে, এদেশে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে যতটা বঞ্চিত এবং অবহেলিত বলা হচ্ছে—আদৌ ততটা তারা নয়, তখন তাদের জন্য সাচার কমিটি গঠন করে, আরও নানাবিধ দান, খয়রাতি, তোষণের বন্দোবস্ত করা কেন?

সত্য হচ্ছে, সাচার কমিটি যা বলেনি, এদেশের সেকুলারপন্থীরাও যা বলেন না—তা হল, এই দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠাংশ এদেশের মূল স্রোতে মিশতে আগ্রহী নয়, কট্টর মৌলবাদী অনুশাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করে,

সঙ্কীর্ণতা দূর করে দৃষ্টি প্রসারিত করতেও আগ্রহী নয়। এবং মুসলমান সমাজের এই সমস্যাটি শুধুমাত্র ভারতে সীমাবদ্ধ নয়। সারা বিশ্বেই মুসলমান সমাজ সঙ্কীর্ণ ঘেরাটোপের ভিতর নিজেকে আটকে রাখতে ব্যস্ত। পাকিস্তানের সমাজতাত্ত্বিক ডঃ ফারুক সালিম বলেছেন, মুসলমান সমাজের এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ী তাদের কট্টর ধর্মীয় অনুশাসন এবং মহিলাদের অন্তরালবর্তিনী করে রাখার মধ্যযুগীয় প্রয়াস। ডঃ ফারুক সালিমের অভিমত, এই কট্টর অনুশাসন থেকে বেরতে না পারলে মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আরও কিছু তথ্য দেওয়া যায়। এদেশে মুসলমান মহিলাদের এখনও কতখানি অন্তরালবর্তিনী করে রাখা হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় জনগণনা রিপোর্টে দাখিল করা তথ্যেও। ২০০১-এর জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী ২৭.৫ শতাংশ হিন্দু মহিলা যখন জীবিকার জন্য বাইরে বের হন, তখন মুসলমান মহিলাদের ভিতর এই সংখ্যা ১৪ শতাংশ।

সাচার কমিটি এবং এদেশের তথাকথিত সেকুলারপন্থীরা একটি সত্যকে স্বীকার করতে চান না যে, হিন্দু সমাজ এই দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুদের থেকে এগিয়ে তাদের মানসিক উদারতা এবং প্রগতিশীল চিন্তাভাবনায়। এই ঔদার্য ততদিন দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুদের ভিতর দেখা যাবে না, যতদিন না অযৌক্তিক তোষণ এবং দান খয়রাত বন্ধ করা হয়। যতদিন না কট্টর মৌলবাদের হাত থেকে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা হয়, ততদিন দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুদের ভিতর মানসিক উদারতা পরিলক্ষিত হবে না। কিন্তু সে পদক্ষেপ সাচার কমিটি কি করেছে? সমস্যা হচ্ছে, সাচার কমিটি এই দান-খয়রাত বন্ধের কথা একটি বারের জন্যও বলেনি। বলেনি কট্টর অনুশাসন এবং সঙ্কীর্ণতার ঘেরাটোপ থেকে দ্বিতীয় সংখ্যাগুরুদের বেরিয়ে আসতে হবে। আসলে মুসলিম মৌলবাদীদের চটাতে সাহস করেনি সাচার কমিটিও। বরং, তা না করে, সাচার কমিটি দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং দর্শন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেই ইন্ধন যুগিয়েছে।

সাচার কমিটি তার প্রতিবেদনে বলেছে—'...the importance given to Sanskrit in the education framework in Delhi and many north Indian states has tended to sideline minority languages. Students have to opt for the Sanskrit as there is no provision to teach urdu (or say other regional languages) in many schools. This, in effect, makes Sanskrit a compulsory subject.' সাচার কমিটির এই বক্তব্যে অবাক হতেই হয়। সাচার কমিটির বক্তব্যটি পড়লে মনে হয়, সংস্কৃতকে তারা শুধু হিন্দুদের ভাষা বলে ঠাউরেছে। এই কথা লেখার সময় কমিটির সদস্যদের একবারও মনে হয়নি, সংস্কৃত পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি ভাষা। এই ভাষাটির সঙ্গে

ভারতীয় দর্শন এবং সংস্কৃতির সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। সংস্কৃত সম্পর্কে সাচার কমিটির এই দৃষ্টিভঙ্গিই বুঝিয়ে দিচ্ছে, এই কমিটির প্রকৃত উদ্দেশ্যটি আসলে কী?

কাজেই, খতিয়ে দেখলে, সাচার কমিটি গঠনের যৌক্তিকতা নিয়ে সত্যই সন্দেহ জাগে। এবং এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে, দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার নাম করে সাচার কমিটি আসলে দান-খয়রাতি-তোষণের রাজনীতিকেই আরও প্রশ্রয় দিয়েছে। আড়াল করেছে সত্যকে। অথচ, ভারতের সংহতির জন্য যা প্রয়োজন ছিল তা কিন্তু সাচার কমিটি নয়। প্রয়োজন ছিল অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের। দুঃখের কথা হল, সেই প্রয়োজনীয় কাজটিই এতদিনে হল না।

মন্তব্য ঃ "সাচার কমিটি নয়, প্রয়োজন অভিন্ন দেওয়ানী বিধি"। গত ৫.৮.২০১৪ তারিখের বর্তমান পত্রিকায় রন্তিদেব সেনগুপ্তের লেখা সাচার কমিটি নয়, প্রয়োজন অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রবন্ধের অবতারণা। আজকাল ভারতের সাংবাদিকদের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, কে কত বড় সেকুলার তার একটা প্রতিযোগিতা চলছে, তার মধ্যে রন্তিদেব সেনগুপ্তকে আমি এক বিরল সাংবাদিক বলেই মনে করি। এবং একটা অকপট সত্য কথা প্রকাশ করার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

কথিত আছে, পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু ইউরেনিয়াম। ভারতে সবচেয়ে মূল্যবান হলো মুসলমান ভোট। কারণ তারা সংগঠিত, সেই ভোট নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসতে কংগ্রেস সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মাননীয় রাজেন্দ্র সাচারকে নিয়োগ করেন, মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা এবং কিভাবে তাদেরকে উন্নয়নে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার পথ নির্ধারণ করতে। বিচারপতি সাচার তার রিপোর্টে শিক্ষা ও সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনগ্রসরতার যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তার ভিত্তিতে মনে হয় মুসলমানরা সত্যই বঞ্চিত। কিন্তু কতকগুলি ক্ষেত্রে যে তারা একচেটিয়া বিচরণ করছে তা সাচার কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ নেই। যেমন পোশাক তৈরি, গাড়ির মিস্ত্রি, রঙ মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, কৃষি শ্রমিক, চর্মশিল্প শ্রমিক, চটকল শ্রমিক, জাহাজের নিম্নশ্রেণীর কর্মী, ফল ব্যবসায়ী, শয্যাদ্রব্য তৈরি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি রিপেয়ার, কশাইখানার কর্মী। এছাড়াও চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, মেয়ে পাচার, গরু পাচার, মাদক পাচার, টাকা জালিয়াতি, জালনোট পাচার, ভাড়াটে খুনি, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি ও পাচার ইত্যাদি।

ভারতীয় জেলখানাগুলির এক সমীক্ষায় প্রকাশ, যদিও ভারতে জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ মুসলমান, জেলখানাগুলিতে প্রায় ৬০ শতাংশই মুসলমান। প্রয়াত কংগ্রেস

নেতা বরকত গনিখান চৌধুরী মালদার এক জনসভায় শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করেন, প্রতি ১০ জন কয়েদির মধ্যে ৭ জন মুসলমান কেন? শ্রোতারা তার কোন উত্তর দিতে পারেনি। মুসলিম নেতা সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি এক জনসভায় বলেছেন, গত ৩০ বছর সিপিএম শাসনে শতকরা ৬০ শতাংশ মুসলমান যুবক সমাজবিরোধীতে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেই তাদের অনগ্রসরতার কথাই ধরা যাক, তারা ইচ্ছে করেই আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করে না, ইংরেজি এবং বাংলা কাফেরদের ভাষা। তারা মাদ্রাসা শিক্ষা শেখে যা বর্তমানকালে চাকুরির ক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগে না। এখানে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু বিতাড়ন আরম্ভ হলে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান প্রশ্ন করেন, হিন্দু শিক্ষকরা সব চলে গেলে মুসলমান ছাত্রদেরকে লেখাপড়া শেখাবে কে? তখন চাঁদপুরের এম.এল.এ. আব্দুল সালাম মোক্তাব চাঁদপুর কলেজ ময়দানে এক জনসভায় বলেন, মুসলমান ছেলেদের লেখাপড়া করার দরকার নেই। কারণ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরৎ মহম্মদ (দঃ) নিরক্ষর ছিলেন। মুসলমান ছেলেরা দেখছে লেখাপড়া শিখে যা রোজগার করা যায় তার থেকে অন্ধকার জগতে প্রবেশ করলে শীঘ্রই বড়লোক হওয়া যায়।

এখানে খাদিম কর্তা অপহরণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া চুন্নু মিঞার কথাই ধরা যাক। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ থেকে এসে আব্বাজানের সঙ্গে প্রথমে তেলেভাজার দোকান খোলে। পরবর্তীকালে চুন্নু মিঞার সম্পত্তির যে হিসাব পুলিশ পেয়েছে তাতে দেখা যায় তার রয়েছে দুটি মিনিবাস, তিনটি গাড়ির মধ্যে একটি 'উনো' একটি 'জেন'। চারটি বাড়ি, দীঘায় তৈরি হচ্ছে ৬০ কামরার হোটেল, পার্ক সার্কাসে রয়েছে হোটেল আর চামড়ার কারখানা। সম্প্রতি সে প্রমোটারিতেও লেগেছে।

লিসবনে গ্রেপ্তার হওয়া মুম্বাই বিস্ফোরণের নায়ক দায়ুদ ইব্রাহিমের চ্যালা আবু সালেম আটের দশকে ভূপাল থেকে এসে মুম্বাইয়ের আন্ধেরীতে ফুটপাথে আশ্রয় নেয়। হকারি দিয়ে জীবন শুরু। ছোট ছোট অপরাধে হাত পাকিয়ে দাউদের দলে যোগ দেয়। এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। এখান থেকে তাড়া খেয়ে বিদেশে পলায়ন। মুম্বাই ফিল্মের নায়িকা মণিকা বেদীকে রক্ষিতা হিসাবে রেখে বিলাসবহুল হোটেলে জীবন-যাপন, বিদেশে থেকেও এ দেশে অপহরণ ও তোলা আদায়ের ব্যবসা চলছে। এককালের মাফিয়া ডন হাজি মস্তানের কথাই ধরা যাক। মুম্বাই পুলিশের এক কনস্টেবলের ছেলে। মুম্বাই ডকের খালাসির চাকুরি দিয়ে জীবন আরম্ভ। তারপর চোরা চালানের মাধ্যমে এক বিত্তশালীতে পরিণত হয়।

কুখ্যাত দাউদ ইব্রাহিমের কথাই ধরা যাক, মুম্বাই বিস্ফোরণের পর দুবাই, সিঙ্গাপুর, কুয়ালালামপুর হয়ে এখন ঘর বেঁধেছে করাচি শহরে। সেখানে তার ৬০০০ বর্গফুটের প্রাসাদ। সেখান বসে ভারতে চলছে তার চোরাচালান, অপহরণ তোলা আদায়ের ব্যবসা এবং চলচ্চিত্র শিল্পে লগ্নীর ব্যবসা। এমনকি তার দিদি হাসিনা পার্কার বোম্বেতে বসে তোলা আদায়ের একটি দল পরিচালনা করে। যার ফলে মুম্বাই আদালতে অভিযুক্ত। কয়েক মাসে আগে অবশ্য তিনি ইন্তেকাল করেছেন। স্ট্যাম্প জালিয়াতির নায়ক আব্দুল করিম তেলগী, তিরিশ হাজার কোটি টাকার জালিয়াতিতে অভিযুক্ত। অতএব মুসলমান যুবকদের কাছে এরাই জীবনের আদর্শ হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কোন বেকার নেই। প্রায় আড়াই কোটি বাংলাদেশী মুসলমান এদেশে অনুপ্রবেশ করে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিঃসন্দেহে যে বিশেষ উন্নতি হয়েছে, সাচার কমিটির রিপোর্টে তার কোন উল্লেখ নেই। চাষযোগ্য জমিও জনসংখ্যার শতকরা হার এবং ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টনের হিসাবে রাজ্যে সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের হাতে রয়েছে সর্বাধিক জমি, সরকারি হিসাব অনুযয়ী মেটিয়াবুরুজ এবং মহেশতলায় চার লক্ষ মুসলমান সেলাইয়ের কাজে নিযুক্ত। অন্য অংশের হিসাব ধরলে এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দশ লক্ষ। ডকে জাহাজে মালপত্র লোডিং এবং আনলোডিংয়ের কাজ মুসলমানদের একচেটিয়া। মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর সাব ডিভিশনে দশ লক্ষ মুসলমান বিড়ি শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় ১৫ লক্ষ মুসলমান বিড়ি শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। গত ১০.৩.২০০৭ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে জাহানারা বেগম নামে এক প্রাক্তন শিক্ষিকা কলকাতার এক প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিকে লেখেন, "কালাহাণ্ডি, আমলাশোল, ডুয়ার্সের চা বাগানে অনাহারে মরে হিন্দু আদিবাসী ও খ্রিস্টানরা। আল্লার কৃপায় অন্তত আমরা মুসলমানরা মরছি না। কিছু কিছু পেশায় আমাদের একচেটিয়া অধিকার যেমন—দর্জির কাজ, জরির কাজ, পোশাক প্রস্তুত, মাংসের দোকান, বিড়ি শিল্প ইত্যাদি।"

এখানে কলকাতা বন্দরে তোলাবাজি সম্বন্ধে গত ১৩.০২.২০১৩ তারিখের প্রথম শ্রেণীর একটি বাংলা পত্রিকায় যা ছাপা হয়েছে তা তুলে ধরছি। ২৪ ঘণ্টার জন্য বন্দরে ট্রেলার দাঁড় করতে হলে দিতে হবে ৫০০ টাকা, খালি কন্টেনারের জন্য ২৪ ঘণ্টায় ৬০০ টাকা, ভর্তি কন্টেনারের ২৪ ঘণ্টায় ১২০০ টাকা। জাহাজ কাটাইয়ের জন্য জাহাজের দাম ৫ কোটি টাকা হলে দিতে হবে ৫ লক্ষ টাকা। মেটিয়াবুরুজ থেকে পোশাক ভর্তি গাড়ির জন্য রেট টাটা-৪০৭ গাড়ি হলে দিতে হবে ৪০০ টাকা, টেম্পো ২০০ টাকা, ট্রাক, বলেরিও ৬০০ টাকা। বন্দরে কাজ করে

চারটি সিণ্ডিকেট। এই সিণ্ডিকেটগুলির মাথায় রয়েছে টিএমসি কাউন্সিলার মুন্না ওরফে ইকবাল আমেদ, কংগ্রেস নেতা মোক্তার, টিএমসি কাউন্সিলার সামসুজ্জমান আনসারির পরিবার। দিনে কয়েক লক্ষ টাকা আয় হয় এই সিণ্ডিকেটগুলির। এলাকার প্রায় ৫০০ মুসলমান যুবক ওই ৪টি সিণ্ডিকেটের সঙ্গে যুক্ত। তোলাবাজির জন্য এই এলাকায় মজুত রয়েছে প্রচুর বেআইনি অস্ত্র। মেটিয়াবুরুজ, ওয়াটগঞ্জ, গার্ডেনরিচ, একবালপুর এই ৪টি থানার সঙ্গে রয়েছে সিণ্ডিকেটগুলির বোঝাপড়া।

এখানে গত ১৬.৭.২০১২-এর প্রথম শ্রেণীর একটি বাংলা পত্রিকার রিপোর্ট পড়ুন। "যৌনপল্লীতে নিজের বোন ও পাঁচ স্ত্রীকে বেচে হাজতে হাফিকুল। মুসলমানদের পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ না করা। এখানে গত ৭.৭.২০১০ তারিখের প্রথম শ্রেণীর একটি বাংলা কাগজের রিপোর্ট পড়ুন।" ফিরোজের অর্থনীতিবিদ হওয়ার স্বপ্নে বাধা সেই অর্থ। এ বছর আল আমিন মিশন থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ফিরোজ। পিতা সবুর আলি ও মা রকেয়া বেগমসহ হত দরিদ্র এই পরিবার এক আত্মীয়ের দানে এক চিলতে জায়গার উপর ছোট্ট মাটির দেওয়াল, খড়ের ছাউনি কুঁড়েঘর, স্ত্রী এবং ৯ ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনমতে দিন কাটে সবুর আলির। কোকড়াঝাড়ের বাঙালি মুসলমান ইউসুফ মমিন। মিজোরামে অশান্তির সময় আশ্রয় নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের যশোডাঙার এক আশ্রয় শিবিরে, তার কথায় "আমার ৯ ছেলে ৪ মেয়ের ঘরে ৭৫ জন নাতি- নাতনি সকলেই আশ্রয় নিয়েছে এই ত্রাণ শিবিরে। বিশ্ববিখ্যাত সানাইবাদক বিসমিল্লা খান সাহেবের পরিবারে সব মিলিয়ে ১০০ জন সদস্য সানাই বাজিয়ে জীবনে বহু টাকা রোজগার করেছে। তবুও অভাব ঘোচে না। মেয়েদের বিয়ে হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। ছেলেদের ঘরে নাতি-নাতনি ৪২ জন। তাই অভাবের তাড়নায় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীজির নিকট আর্থিক সাহায্যের আবেদন করায় বাজপেয়ীজি দুই লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন। তালিবান নেতা ওসামা বিন লাদেনের পিতার ৫১টি সন্তানের মধ্যে ওসামা ১৭ নম্বর সন্তান।

মহনুল উদ্দীন ঃ ঠিকানা চোরাই বাড়ি, উত্তর ত্রিপুরা; প্রফেসান, অসম থেকে ত্রিপুরায় মদ পাচারকারী, বয়স ৩৭। মোট বিবাহ ১১টি, তাদের ঠিকানা বিভিন্ন অসম, ত্রিপুরা বর্ডার, মোট সন্তানের সংখ্যা ৩১টি, বউ-রা সব শ্বশুরবাড়িতে থাকে। গত ২০১২ সালে বিভিন্ন বউ-এর গর্ভে ৭টি সন্তান জন্মেছে। বরকত মিঞার তিন বৌয়ের ঘরে ২৭টা সন্তান। বাকি লক্ষ্মীকাঠি উত্তর ২৪ পরগণার গরু ব্যবসায়ী, উত্তর ২৪ পরগণার হাসান গাজী বহু অপরাধের সঙ্গে জড়িত, তার বাড়িতে পুলিশ গেলে তার স্ত্রী জাহানারা বিবি বলে বিভিন্ন জায়গায় হাসানের অন্তত ১২টা স্ত্রী আছে। কখন সে কোথায় থাকে সে জানে না। এদের ঘরে

সন্তান-সন্ততি কত তারও হিসাব নেই। মঃ ইসাক (৫০) জনমজুর, স্ত্রী মোসম্মৎ বিসমিল্লা (৪০) তাদের ২৩ সন্তান -সন্ততির মধ্যে ৩ জন মৃত। বাড়ি হরিয়ানার অখেরা গ্রামে, তাদের পুরো পরিবারের ছবি ছাপা হয়েছে হিন্দুস্তান টাইমস-এ গত ৬.৭.২০০৭ সংখ্যায়। বাংলাদেশের মৌলবাদী নেতা গোলাম আজমের লেখা "মুক্তির কষ্টিপাথরে জন্ম নিয়ন্ত্রণ" বই মুসলমানদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে। ধর্মগ্রন্থ থেকে আরবিতে লেখা আয়াত ও তার বাংলা তর্জমা দিয়ে বোঝান হচ্ছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ ইসলাম বিরোধী, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে দোজকে (নরকে) যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মুসলিম জনসংখ্যাধিক্য জেলা মুর্শিদাবাদ। সেখানে ৩ লাখ মহিলাকে তালাক না দিয়ে বাচ্চা কাচ্চা সহ স্বামীরা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে আবার বিয়ে করে নিয়েছে। ঐ জেলাতেই এক লক্ষ মহিলা তালাক প্রাপ্তা। এদের সন্তানরাই হবে চোর, ডাকাত, এই সব সম্বন্ধে সাচার কমিটির কোন মন্তব্য নেই।

হিন্দুরা কি অবস্থায় আছে। তার একটা সংবাদ গত ২০.৯.২০০৪ তারিখে একটা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পুরোহিত মানিক গাঙ্গুলির তিন কন্যা একসঙ্গে বিষ খেল, তার মধ্যে ময়না (২০) মৃত, দু'জন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে; কারণ দরিদ্র পুরোহিত মেয়েদের বিবাহের পণের টাকা যোগাড় করতে পারেননি। মুখার্জি উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের পুত্র এই শহরে একটি আধা সরকারি অফিসে পার্টটাইম সুইপারের কাজ করতেন। সুইপারের কাজ কি? পায়খানা, প্রস্রাবখানা পরিষ্কার করা এবং ফ্লোর ঝাড়ু দেওয়া, তার নিয়োগপত্রের কপি আমার সংগ্রহে আছে, বেশ কিছুদিন পূর্বে অভাবের তাড়নায় উক্ত ব্রাহ্মণ সুইপার বিনা চিকিৎসায় পরলোকগমন করেছেন বলে সংবাদ পেয়েছি। হিন্দু বিধবারা বৃন্দাবন, তিরুপতি, পুরীতে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করছে। মুসলমান তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা সরকারি অর্থ ভাণ্ডার থেকে মাসোহারা পাচ্ছে। ইমাম, মৌলবিরা সরকারি তহবিল থেকে মাইনে পাচ্ছে, দশ কোটি আদিবাসীর কথা কেউ বলে না। এক সরকারি সমীক্ষায় প্রকাশ ৮০ শতাংশ আদিবাসীর খাদ্য নিরাপত্তা নেই। ৪৩ শতাংশ শিশুর ওজন কম। কারণ তাদের মায়েরা রক্তশূন্যতায় ভোগেন, ১০ জন গর্ভবতীর মধ্যে ৯ জন উপযুক্ত খাদ্য পায় না। বহু শিশু ৫ বছর পূর্ণ হবার আগেই মারা যায়।

এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেছে, কোথাও কোন পথ দুর্ঘটনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন লোক মারা গেলে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে তাণ্ডব চালায় এবং কোটি কোটি টাকার সরকারি ও বেসরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে। এখানে সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। গত ২০.২.২০১২ তারিখে রাজাবাজার

ট্রাম ডিপোর মধ্যে ঢোকার পথে একটি সরকারি বাসের ধাক্কায় জনৈক মহম্মদ সাকিল-এর মৃত্যু হয়। তারপর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা ট্রাম ডিপোতে ঢুকে ৪৬টি বাস, ১১টি গাড়ি এবং ২টি ট্রাম ভেঙে তছনছ করে দেয়। এর পুরস্কারস্বরূপ পরিবহন মন্ত্রী নিহতের বাড়ি গিয়ে ৫০ হাজার টাকার নগদ এবং পরিবারের একজনকে সরকারি চাকুরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন। তসলিমা বিতাড়নের উদ্দেশ্যে শহরে মুসলমানরা যে তাণ্ডব চালায় তা সর্বজনবিদিত। কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি ও গাড়ি ধ্বংস হয়। পরে সামরিক বাহিনী নামিয়ে অবস্থা আয়ত্তে আনা হয়। এই অভিযোগে কোন দুষ্কৃতীর শাস্তি হয়নি। কোন মুসলমান মহিলা ধর্ষিতা হলে আশাতীত ক্ষতিপূরণ পান। ফুলবাগানের ফুটপাথবাসিনী নাহার বানু ধর্ষিতা হয়ে একটি পেনশন এবেল সরকারি চাকুরি এবং থাকার জন্য সরকারি বাসস্থান পান। ধর্ষক নীলু ঘোষ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছেন, বাংলাদেশের জনৈক আওয়ামি লিগ কর্মী এ দেশে এসে হাওড়া রেল স্টেশনে দালালদের মারফৎ আজমীর শরিফ যাওয়ার টিকিট রিজার্ভেশন করতে গিয়ে ধর্ষিতা হন। মহামান্য আদালত রেল কোম্পানিকে ১২ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণের নির্দেশ দেন। ঐ টাকা বাংলাদেশী টাকায় কনভার্ট করে ১৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা নিয়ে তিনি বাংলাদেশে চলে যান। এখানে বোধগম্য হল না রেলের দোষ কোথায়? রেল কর্তৃপক্ষ উচ্চ আদালতে আপিল না করে ভিজে বেড়ালের মতো অন্যায় আদেশ মেনে নেয়।

বোম্বের বাঙালি আইনজীবী পল্লবী ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ঐ ফ্ল্যাটের রক্ষী মহম্মদ সাজ্জাদ আহমেদের (২২) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল বোম্বে হাইকোর্ট। পল্লবী যাতে চিৎকার করতে না পারে তারজন্য সাজ্জাদ তার শ্বাসনালী কেটে দেয়। পল্লবীর দেহে ১৬টি আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়। তার স্বামী অভীক সেন গুপ্ত ঘরে ঢুকে পল্লবীকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটার ফলে গত নভেম্বর ২০১৩ সালে মৃত্যু হয়। পল্লবীকে ধর্ষণের ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, অথচ ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে ধর্ষণ ও হত্যার অভিযোগে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। যদিও তার জামাকাপড় ইত্যাদিতে ধর্ষণের আনুষঙ্গিক পরীক্ষা ছাড়াই তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হয়।

সমগ্র লেখাটি পর্যালোচনা করলে বলতে পারি মুসলমানরা গাছেরও খাবে, তলারও কুড়াবে। বহু বিবাহ, যথেচ্ছ সন্তান-সন্ততি উৎপাদন, তালাক ইত্যাদিতে শরিয়তের দোহাই দেবে আর অন্য ব্যাপারে ভারতের অভিন্ন দেওয়ানি আইনের সুবিধা নেবে তা অনির্দিষ্টকাল চলতে পারে না, হয় তারা পুরো অভিন্ন দেওয়ানি বিধি মেনে নিক না হয় পুরো শরিয়ৎ-এর আইন মেনে নিক। মুসলমান চুরি করলে

তার হাত কেটে নিতে হবে, কোন মুসলমান পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি করতে পারবে না কারণ ইসলাম ধর্মে ফটো তোলা নিষেধ। মুসলিম মহিলা ধর্ষিতা হলে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী যোগাড় করতে না পারলে তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলতে হবে। কোনো মুসলমান ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে টাকা রেখে রেখে সুদ খেতে পারবে না, কেন মুসলমানরা টিভি, ফোন, মোবাইল, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না—কারণগুলি ইসলামবিরোধী।

রবীন্দ্রনাথ দত্ত
কলকাতা-৬৪

"ইসলামি শাস্তি ও বিধর্মী সংহার" বইতে নুসরাত জাহান আয়শা সিদ্দিকির লেখা ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বাসিন্দা নুসরাত জাহান আয়শা সিদ্দিকা নামে জনৈক মুসলিম মহিলা একটা বই লিখেছেন, নাম ইসলামি শাস্তি ও বিধর্মী সংহার। বইটা প্রকাশ করেছেন সুলতান বিনতে লায়লা আঞ্জুমান্দ আরা বানু, মিরপুর, ঢাকা। এখানে বিনা মন্তব্যে বইটার ভূমিকা ও প্রকাশিকার কথা তুলে দেওয়া হলো। ২০০৯ সালে ঢাকা যাওয়ার পর পত্র লেখিকা আমাকে এক কপি বই উপহার দিয়েছেন।

আপনারা নিশ্চয়ই রাজশাহীর একটাকিয়ার রাজাদের কথা শুনেছেন; রাজশাহীর চলন বিল এলাকার সপ্তদুর্গা বা সাতগড়ায় যাদের রাজধানী ছিল। এঁরা রাজা হলেও প্রতি বছর নিতান্ত পক্ষে একবার গৌড় বা দিল্লির বাদশাহ্-এর নিকট গিয়ে তাদেরকে বন্দনা করতে বাধ্য ছিলেন। সেই নিয়ম অনুসারে রাজা মদন নারায়ণ নিজের দুই পুত্র কন্দর্প নারায়ণ ও কামদেব নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে গৌড়ের বাদশাহ সৈয়দ হোসেন শাহ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। সৈয়দ হোসেন শাহ-এর চার স্ত্রীর গর্ভে বহু কন্যা হয়েছিল, তার মধ্যে দুটির বয়স ২০ বছরের অধিক হয়েছিল; অথচ যোগ্য পাত্র না পাওয়ায় তাদের বিয়ে দিতে না পারায় খুব চিন্তিত ছিলেন। হোসেনশাহ সৈয়দ বংশের লোক, নিম্নশ্রেণী থেকে ধর্মান্তরিত এদেশীয় মুসলমানগণকে তিনি সমকক্ষ মনে করতেন না, তাই হোসেন শাহ দেখলেন মদনের পুত্রদ্বয় অতি সুন্দর, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং যুবা পুরুষ। তারা কুলীন ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত্র। সুতরাং সর্বাংশেই তার কন্যার যোগ্য পাত্র। তিনি অমনি মদনকে সপুত্র আটক করে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। মদন অতি বিনীতভাবে

বললেন, "ধর্মাবতার! আপনি আমাদের রাজা এবং রক্ষক, আমি আপনার একান্ত অনুগত এবং হিতার্থী ভৃত্য। আমার প্রতি অত্যাচার করা হুজুরের পদবীর অযোগ্য।" বাদশাহ চতুরতাপূর্বক বললেন, "খাঁ সাহেব আমি একটাকিয়ার রাজবংশদেরকে অতিশয় ভালবাসি এবং মান্য করি। তোমরা যেমন হিন্দুদের গুরু ব্রাহ্মণ, আমরা তেমনি মুসলমানের গুরু সৈয়দ। তোমাদের কন্যা যেমন অপর হিন্দু বিয়ে করতে পারে না, তেমনি আমাদের কন্যাও অপর মুসলমান বিয়ে করতে পারে না। তোমাকে অতীব সম্ভ্রান্ত জেনেই তোমার পুত্রদের সঙ্গে আমি কন্যার বিয়ে দিতে ইচ্ছা করি; কোনরূপ অত্যাচার করা অভিপ্রায় নহে। আমি তোমার পুত্রদের মুসলমান হতে বলি না বরং পত্নীই পতির ধর্ম অনুসরণ করে ইহাই জগতে সাধারণ রীতি। তুমি যদি আমার কন্যাদেরকে স্বজাতিতে মিলিয়ে নিতে চাও তাতেও আমি সম্মত আছি। নতুবা তোমার পুত্রেরা আমার ধর্ম গ্রহণ করুক। আমি তাদেরকে স্বজাতিতে মিলিয়ে নিব। এই উভয় প্রস্তাব মধ্যে যেটি তোমার বাঞ্ছিত হয় আমি তাই স্বীকার করব। কিন্তু যদি তুমি উভয়ই অস্বীকার কর, তবে আমি বলপূর্বক তোমাকে বাধ্য করব।" মদন বাদশাহের উগ্র স্বভাব জানতেন, তিনি দেখলেন বাদশাহের উভয় প্রস্তাব অস্বীকার করলে বহু লোকের প্রাণনাশ ও জাতি নাশ হবে। আর মুসলমান মেয়েকে নিজ জাতিতে মিলাবার কোন উপায়ও নাই। অগত্যা তিনি দুই পুত্রের মায়া ত্যাগ করলেন। তারা মুসলমান হয়ে শাহ্জাদীদ্বয়কে বিয়ে করল। হোসেন শাহ পরে মদনের অন্য পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সহ আরও এগার জনকে ধরে এনে মুসলমান করলেন এবং তাঁদের সঙ্গে নিজের অবশিষ্ট সমস্ত কন্যাদের বিয়ে দিলেন। মদনের চতুর্থ পুত্র রতিকান্তের দৃষ্টিশক্তি কম ছিল, সে রাত্রিতে একেবারেই দেখতে পেত না। বাদশাহ্ কেবল তাকে ছেড়ে দিলেন। বাদশাহ রহস্য করে মদনকে বললেন, "বুঝেছ বিয়াই, যে অন্ধ সেই হিন্দু থাকুক; যার চক্ষু আছে তার মুসলমান হওয়াই উচিত।" এইভাবে শুধু একটাকিয়ার রাজপরিবার থেকে ২৯ জন রাজকুমারকে মুসলমান করা হয়েছিল। সম্রাট আকবর একটাকিয়ার রাজকুমার চন্দ্রনারায়ণ এবং সঙ্গীত শাস্ত্রবিদ বিখ্যাত কাশ্মিরী পণ্ডিত তানসেন-এর সাথে দুই কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবের প্রথম জামাতা কাশ্মীরি পণ্ডিত কৃষ্ণনারায়ণ। আলমগীর তৎকালীন বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন যে, একটাকিয়ার ঠাকুর বংশে সুপাত্র থাকলে তাদেরকে আটক করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় দিল্লিতে পাঠিয়ে দেন; কিন্তু এই পাত্র যে পর্যন্ত ভক্ত মুসলমান না হয় সে পর্যন্ত যেন তাকে দিল্লিতে পাঠান না হয়। কেননা তার কন্যার বর ঘৃণিত কাফের স্বভাবে তাঁর সামনে হাজির হওয়া তিনি ইচ্ছা করেন না। দাদীর কাছ থেকে এই ইতিহাস ছোটবেলাই শুনেছি।

দাদী আরও বলেছিলেন, আমরা রাজকুমার কন্দর্প নারায়ণের বংশধর। কামদেব নারায়ণ অদৃষ্টকে মেনে নিলেও কন্দর্প নারায়ণ মনে প্রাণে মুসলমান হতে পারলেন না। কিন্তু কোনও উপায়ও ছিল না। তাই বংশপরম্পরায় এই ইতিহাস পরবর্তী বংশধরদের জানিয়ে রাখতে হুকুম দিয়েছিলেন। আমি কন্দর্প নারায়ণের ২৩তম বংশধর। আমার পূর্ব পুরুষের সেই অপমান অত্যাচারের জ্বালা আমার রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু তাই বলে আমি কালাচাঁদ ওরফে কালাপাহাড়ের মত দুলারী বিবিকে এবং যদু নারায়ণ ওরফে জালালুদ্দিন-এর মত আশমান তারাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়ে স্বজাতির প্রতি আক্রোশবশতঃ ইসলামের বর্বরতা চাপানোর মত আহাম্মক নই। কি আশ্চর্য আমার পূর্বপুরুষ আর কালাপাহাড় শুধু বিয়ে করতে বাধ্য হয়ে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন অথচ এদেশের ৯০ শতাংশ মুসলমান কালাপাহাড় জালালউদ্দিন সহ অন্যান্যদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে মুসলমান হয়েছিল তা এরা মনেই রাখে নাই। মধ্যযুগে ইসলামি সুনামীর বর্বরতায় মরুভূমির বালি এসে এদেশের উর্বর মাটি ঢেকে ফেলেছে; সে মরু বালি সরিয়ে উর্বর মাটি পুনরুদ্ধারে কারো কোনো ইচ্ছা নাই। অন্ধকার রজনীতে ঝড়-ঝঞ্ঝায় নাবিক পথ হারালে ভোর হলে নাবিক সঠিক পথের সন্ধান করে। অথচ কি আশ্চর্য কেউ সঠিক পথের সন্ধান করছে না। সত্যিই বাংলার মানুষের বড় ভুলো মন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে আমি মধ্যযুগীয় বর্বরতার কিছু ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তুলে ধরতে চেয়েছি আমরা কোন পরিস্থিতিতে মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলাম।

প্রকাশিকা লায়লা আঞ্জুমান্দ আরা বানুর লেখা

আমি জন্মগতভাবে একজন মুসলমান। পিতার ইচ্ছা আমি ইসলামি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত হই। এজন্য আমার পিতা আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করান। আমি নিষ্ঠা সহকারে ইসলামি বিষয়ে পড়াশুনা করি। পরিণত বয়সে আমি বুঝতে পারি ইসলাম আমার জন্য নয়। এটি আরবের বর্বর বেদুইনদের জন্য। সে কারণে আমি নিজেকে একজন হিন্দু ভাবতে থাকি। ইতিহাস পড়ে আমি দেখতে পেলাম আমারও এদেশের মুসলমানদের পূর্বপুরুষ কেউই স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। মধ্যযুগের বর্বরতার শিকার হয়ে বাধ্য হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন। আমি মনে মনে প্রশ্ন করলাম, তাহলে আমি কেন এই বর্বরতার স্মৃতি চিহ্ন বয়ে নিয়ে বেড়াব। আমি ঠিক করলাম, আমি আমার পূর্বপুরুষের শাশ্বত সনাতন ধর্ম গ্রহণ করব, করেছিও। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি একজন সনাতন ধর্মীয় স্বামীও পেয়েছি। হিন্দুরা আমাকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। তারা ইতিহাস পড়ে না। ইতিহাস পড়লে তারা বুঝত আমরা কেন মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিলাম। অতএব

আমাদের উদ্ধার করার দায়িত্ব যেমন আমাদের আছে; তেমনি তোমাদেরও আছে। লেখিকা ইসলামি শান্তি ও বিধর্মী সংহারের চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন। এদেশ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ জানে না কেন তারা মুসলমান হয়েছে। জানে না কারণ তারা ইতিহাস পড়ে না; কোরান হাদিসও পড়ে না। অনেকে জানে কিন্তু বলে না। আমরা কতটুকু পেরেছি তা বিচার করবেন ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিগণ; যারা অভিনিবেশ সহকারে কোরান হাদিস চর্চা করেন। আমার পূর্ণ পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দিলাম না। কারণ আপনারা আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠ করলেই জানবেন। আশা করি আমার মুসলমান ভাইসহ হিন্দু ভাইগণও আমাদের বহু পরিশ্রমের ফসল এই বইখানি পাঠ করবেন এবং তাহলেই আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

ইসলামি দেশগুলিতে বিধর্মীদের (কাফেরদের) প্রতি পক্ষপাতিত্ব

এটা সর্বজনবিদিত যে মুসলমানরা পৃথিবীর সর্বত্র তাদের মসজিদ, কবরখানা, মাজার, ঈদগা ইত্যাদি তৈরি করে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু তাদের দেশে অন্য কোন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির, পেগোডা, গুরুদ্বারা, গির্জা তৈরি করতে দেয় না। সৌদি আরবে একটাও অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার স্থান নেই। বর্তমান যুগেও তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার না করেও সমগ্র পৃথিবীতে তাদের ধর্মাচরণের ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে তারা পশু জবাই করার স্বাধীনতা ভোগ করে কিন্তু তাদের দেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের এক কোপে পশু বলির অনুমতি দেয় না। সমগ্র পৃথিবীতে তাদের ধর্মীয় বিদ্যালয় যথা—মাদ্রাসা, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় (ভারতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লিতে জামিয়া মিলিয়া ইউপিতে দেওবন্দ ইত্যাদি) স্থাপনের স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা দেবে কি মক্কা অথবা মদিনায় একটা সংস্কৃত টোল খুলতে? মুসলমান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তারা সমগ্র পৃথিবীতে ছুটি ভোগ করে। কিন্তু তাদের দেশে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসবে ছুটি দেয় না। পৃথিবীব্যাপী তারা মহরমের মিছিল বার করে কিন্তু মক্কাশরীফে দেবে কি একটি জন্মাষ্টমীর মিছিল করতে। কোন মুসলমান দেশে তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী বা উচ্চপদাধিকারী হতে দেয় না অথচ সর্বত্র মুসলমানরা নানা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে। ভারত ৮৭ শতাংশ হিন্দুর বাসস্থান হলেও কয়েকজন মুসলমান রাষ্ট্রপতি .... প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সৌদি আরবে কোন অমুসলমানকে কোন রাষ্ট্রীয় উচ্চপদে বসতে দেবে কি? সমগ্র পৃথিবীতে তারা গরু

জবাই এবং গোমাংস ভক্ষণ করছে। সৌদি আরবে দেবে কি শুয়োর কাটতে এবং তার মাংস ভক্ষণ করতে? সৌদি আরবের মক্কা মদিনা শহরের ৩৫ মাইলের মধ্যে বিধর্মী কাফেরদের প্রবেশ নিষেধ। পক্ষান্তরে হিন্দুদের তীর্থস্থান, কাশী, তিরুপতি, পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন হরিদ্বার ইত্যাদি শহরে মুসলমানদের অবাধ বিচরণ। ভারতে জুম্মাবারে তারা রাস্তা অবরোধ করে নামাজ পড়ে, হিন্দুরা তার কোন প্রতিবাদ করে না। সৌদি আরবে দেবে কি অন্য ধর্মাবলম্বীদের রাস্তা বন্ধ করে প্রার্থনা করতে? যত মত তত পথ-এর প্রবক্তা আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন, পৃথিবীর সর্বত্র তাদের শাখা আছে কিন্তু কোন মুসলিম দেশে তাদের কোন শাখা নেই। সৌদি আরবের বন্দরগুলিতে জাহাজ গেলে তার আগেই নাবিকদের সতর্ক করে দেওয়া হয় তাদের উপাস্য দেবতার ফটো অথবা মূর্তি (যথা বিষ্ণু, শিবলিঙ্গ বা দেবদেবীর ফটো) যেন বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়, জাহাজ পরিদর্শনে এসে স্থানীয় পুলিশ যদি ঐসব দেখতে পায় তবে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। জনৈক নাবিকের নিকট শুনেছি খৃষ্টান হওয়ার ফলে তার হাতে ক্রস চিহ্ন খোদাই করা ছিল। তিনি হাফশার্ট পরে জাহাজ থেকে নামার ফলে তাকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যায়, তারপর সে দেশের রাষ্ট্রদূতের হস্তক্ষেপে ছাড়া পায় এবং লিখিত অঙ্গীকার দিতে হয় আর কোনদিন জাহাজ থেকে নামবেন না। সৌদি আরবের আকাশসীমায় প্রবেশের আগে বিমানের ঘোষিকারা জানিয়ে দেয় এবার তারা সৌদি আকাশ সীমায় প্রবেশ করছে, মহিলারা যাতে বোরখা জাতীয় ইসলামি পোশাক পরে নেয়, তখন তারা শৌচাগারে গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে আসে। আমাদের দেশে অনেক ধর্মনিরপেক্ষ মহিলা নেত্রী আছেন, তাদেরকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি একবার স্বধর্মীয় পোশাক পরে মক্কা মদিনা ঘুরে আসতে পারলে আমি তাদের পরিত্যক্ত কাপড় কেচে দিয়ে আসবো।

সৌদি আরবে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে মুসলমান কর্মীর পরিবার পাবে এক লক্ষ রিয়াল। খৃষ্টান শ্রমিক মারা গেলে তার পরিবার পাবে ৫০ হাজার রিয়াল, কিন্তু মূর্তি পূজক কাফের-এর মৃত্যু হলে তার পরিবার পাবে ৬৬৬৬ রিয়াল। কাজ করতে গিয়ে এমন অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে প্রায় ২৫ হাজারেরও বেশি হিন্দু যুবক সেখানে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। এইসব সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে গিয়াসুদ্দিন-এর লেখা 'প্রসঙ্গ ঃ মুসলমান সমাজে সংস্কার' বইটা পড়ে দেখতে পারেন। প্রাপ্তিস্থান বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র (কলেজ স্ট্রিট) কলকাতা-৭৩, মূল্য ২০ টাকা।

এবার আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিক গৌতম রায়ের লেখা থেকে কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি যা প্রকাশিত হয়েছে ৯.১২.২০০৯ তারিখে।

ইউরোপে বসবাসকারী মুসলিমদের জনসংখ্যার চাপে সেখানকার আদিবাসীরা

শঙ্কিত। সৌদি আরব কি অমুসলিমদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা শিরোধার্য করে? সে দেশে কি বাইবেল সঙ্গে নিয়ে কোনও খৃষ্টান পা রাখতে পারেন? একটাও কি গির্জা রয়েছে ওই বিস্তীর্ণ মরু প্রান্তরে, ক্যাথলিক চার্চের ঘাঁটি রোমে কিন্তু একাধিক মসজিদ রয়েছে। মক্কার প্রাচীন গির্জাগুলো কোথায় গেল? প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসাবেও কি সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে। বামিয়ানের বুদ্ধ মূর্তিগুলো ধ্বংসকারী তালিবানদের বর্বরতার কথা নাইবা বলা গেল। মক্কা বা মদিনায় অমুসলিম কেউ নিজের ধর্ম অবাধে আচরণ করতে পারবে? সৌদি শেখদের অকৃপণ তহবিল নিয়ে ভারতের মতো অইসলামিক রাষ্ট্রে নিয়মিত গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল মসজিদ মাদ্রাসা, মক্তব, নিত্য সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে পেট্রোডলার। বিনিময়ে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কি সৌদি আরবের মক্কা, জেড্ডা কিংবা রিয়াদে একটা রামমন্দির বানাতে পারবে? অথবা ইস্কনের একটা কৃষ্ণ মন্দির? ইন্দোনেশিয়ায় কি অবস্থা সেখানকার আহমেদিয়াদের? সুন্নিরা কি ঐ মুসলমানদের কোন মসজিদ গড়তে দেবে? পাকিস্তান কি শিয়াদের, আহমিদিয়াদের স্বধর্মাচরণের স্বাধীনতা দেয়? কিংবা খৃষ্টানদের? ইরাকে সুন্নিরা কেন বেছে বেছে শিয়া মসজিদ ও ধর্মীয় সমাবেশ-গুলিতে হামলা চালায়।

গত ১৬.১০.২০০৭ তারিখে শ্রীঅরবিন্দ কর নামে এক ভদ্রলোক দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটি পত্র লিখেছেন, তার কিছু অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো—

সার্বিয়াতে যখন ডেমোগ্রাফিক চরিত্র বদলে দেওয়ার জন্য সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পনামাফিক হাজার হাজার মুসলিম মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল, যাতে যখন তাদের সন্তান হবে তারা মিক্সড পপুলেশন বলে গণ্য হবে, তখন সমগ্র মুসলিম দুনিয়া কিছুই করতে পারেনি (লেখকের মন্তব্য—মাতা ও ভগ্নীদের উপর এই অত্যাচারকে আমি বর্বরোচিত মনে করি এবং এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই) চীনের উইসুর প্রদেশের মুসলিমরা যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তাদের লাইন করে রাস্তার ধারে ফাঁসিতে লটকানো হয়েছিল। আর সমস্ত মুসলিম জনতাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে তা দেখতে বাধ্য করা হয়েছিল। তখনও সমগ্র মুসলিম দুনিয়া নীরব ছিল। তাদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে এই তিনটি (আমেরিকা, রাশিয়া, চীন) দেশের যা আণবিক অস্ত্রভাণ্ডার আছে সেই তুলনায় পাকিস্তান আর ইরানের অস্ত্রগুলি পেটো বোমার সামিল। তারা একশোবার আরব সমেত সমগ্র মুসলিম দুনিয়াকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আজ না হয় তেলের জন্য আরব দুনিয়াকে তোল্লা দিচ্ছে, কিন্তু একদিন তো তেল ফুরোবে অথবা তেলের বিকল্প বের হয়ে যাবে। সেদিন যদি কোন আমেরিকান, রাশিয়ান বা চীনা তসলিমার থেকেও আরও

অশালীন ভাষায় ইসলাম, আল্লা মোহাম্মদের সমালোচনা করেন তখন তারা কি করবেন? বেশি বাড়াবাড়ি করলে তো ধর্মীয় পীঠস্থান সমেত গোটা আরব দুনিয়াকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে।

যীশুর মৃত্যুর পর থেকে ইহুদিদের কোন নিজস্ব দেশ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করে। তারা পৃথিবীর নানা দেশে বসবাস করছিলেন। ১৯৪৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্যালেস্তাইনকে ইহুদি ও আরবদের মধ্যে বিভক্ত করে দেওয়ায় ১৯৪৮-এর ১৫ই মে ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল গঠিত হয়। জনসংখ্যা মাত্র ৬০ লক্ষ। ১৯৪৯-এর জানুয়ারি মাসে সমস্ত আরব রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে শিশু রাষ্ট্র ইজরাইলকে আক্রমণ করে এবং ঘোষণা করে, এই রাষ্ট্রকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে দেবে। কিন্তু আজ সমগ্র আরব রাষ্ট্রসমূহ ইজরাইলকে যমের মত ভয় করে। যদি আরবদের আক্রমণে একজন ইহুদির মৃত্যু হয় তবে ইজরাইল বাহিনীর আক্রমণে ১০০ জন আরবের জীবনহানি হয়। একবার নিকটবর্তী এক মুসলিম রাষ্ট্রের সমগ্র পার্লামেন্ট সদস্যদেরকে ইজরাইল সেনারা বন্দী করে নিয়ে আসে। আরব রাষ্ট্রগুলি কিছুই করতে পারেনি। মুসলমানরা হল শক্তের ভক্ত আর নরমের যম।

ইসলামের স্বরূপ জানতে কোরান পাঠ জরুরি

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

আমাদের পূর্বপুরুষেরা বড় মাপের যতগুলো পাপ করেছেন, তার মধ্যে ক্ষমাহীন মহাপাপ হচ্ছে কোরান-হাদিস এবং ইসলামের ইতিহাস না পড়া। তাই গিরিশচন্দ্র সেনের সময় থেকে ভারতে বাংলা ভাষায় কোরান পাওয়া যেত। কিন্তু তৎকালীন হিন্দু পণ্ডিত সমাজ কোরান পড়া তো দূরের কথা, কোরান স্পর্শ করাকেও মহাপাপ বলে মনে করতেন। আজও ঐ মনোভাবের অবলুপ্তি ঘটেনি। আমাদের পণ্ডিতমণ্ডলী ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে যদি কোরান পড়তেন, তাহলে আজ হিন্দু-বৌদ্ধদের এত দুর্গতি হত না। গত ২৫ বছর ধরে আমাদের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে ইসলামের মূল তত্ত্ব প্রচার করার চেষ্টা করছি। কিন্তু আশানুরূপ সাফল্য আসেনি এখনও। আমাদের রাজনীতিবিদ এবং যুবক-যুবতী কিংবা প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের কোরান-হদিস পড়ার মতো সময় নেই।

ইসলামের মূল তত্ত্ব না জেনে বা এগিয়ে গিয়ে কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ গান্ধীজি হিন্দু-মুসলিম মিলনের জন্য সম্ভব-অসম্ভব সব কিছুই করেছেন। কিন্তু ভারত-

বিভাজন আটকাতে পারেননি। তাঁর চোখের সামনে জিন্নাহ্‌-লিয়াকত সাহেবরা হিন্দু সমাজের জাত-পাত ও অস্পৃশ্যতাকে মূলধন করে তফসিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলকে দিয়ে তফসিলী মুসলিম ঐক্যের ধুয়ো তুলে দেশ-ভাগ ত্বরান্বিত করেছিলেন। আজও অনুরূপ চেষ্টা চলছে। মিঃ মণ্ডল পাকিস্তানের মধ্যেই তফসিলীদের আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। সেই আলোর ঝলকানি যখন তফসিলীসহ হাজার হাজার হিন্দুর ধন-মান-প্রাণ-ইজ্জত ছারখার করে দিল তখন তিনি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভারতে পালিয়ে এলেন। পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তানে ফেলে এলেন তফসিলীসহ কয়েক কোটি হিন্দু। ১৯৪৭-এর পরেও ওখানকার কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট হিন্দুরা 'ইসলাম কি বস্তু' তা বোঝার চেষ্টা না করে মুসলিম লীগকে হটাবার কাজে শেখ মুজিবরের সাথী হয়ে সংগ্রাম শুরু করলেন। ভারত সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় সৃষ্টি হয় নতুন ইতিহাস; জন্ম হয় ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতাই হবে নতুন বাংলাদেশের বাঁচার মন্ত্র', শেখ মুজিবের এই প্রতিজ্ঞার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে শেখ হাসিনা ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ শুরু করলেন। সকল প্রকার মানবিক যুক্তি, মুক্ত চিন্তা এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অবজ্ঞা করে ওখানকার সংবিধানে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' জিইয়ে রাখলেন। তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত ৫ম সংশোধনীর 'বিসমিল্লাহির-রহমানির-রাহিম' বাক্যটি। শুরু হয়ে গেল ধর্মভিত্তিক অপরাজনীতির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা।

মিঃ আইয়ুব খান পাকিস্তানকে হিন্দু-বৌদ্ধশূন্য করার উদ্দেশ্যে ১৯৬৫-তে 'শত্রু সম্পত্তি আইন' তৈরি করে সংখ্যালঘু বিতাড়ন শুরু করেন। মানবিক দৃষ্টিতে এবং নবগঠিত মুজিব নগর সরকারের ঘোষণা অনুসারে ঐ কুৎসিত আইনটির স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ১৯৭১-এ। পরে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে যে, ঐ আইনটি মৃত। কিন্তু সংখ্যালঘুদের জমি কেড়ে নেওয়া বন্ধ হয়নি কখনও। ঐ মৃত আইনের বলেই মুসলমানরা সংখ্যালঘুদের ৬ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমি কেড়ে নিয়েছে। এরমধ্যে ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার একর হজম হয়ে গেছে। সরকারের হাতে আছে মাত্র ১ লক্ষ একর। (আঃ বাঃ পত্রিকা ১৫/১২/২০১২) শেখ হাসিনা গত ২৯শে নভেম্বর, ২০১১ তারিখে ঐ মৃত আইনের দেহে প্রাণ সঞ্চার করলেন সংখ্যালঘুদের কেড়ে নেওয়া জমি ফিরিয়ে দেবার নাম করে। নতুন একটি আইন পাশ করে একটু ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিলেন হিন্দুরা-বৌদ্ধরা সত্যি 'ইসলামের শত্রু'। নতুন এই আইন অনুসারে একজন বাংলাদেশী মুসলমান (হোক না সে মহাসাধু কিংবা চোর-ডাকাত, রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী বা নারীধর্ষণকারী) পৃথিবীর যে কোন দেশে যতদিনই বাস করুক না

কেন, বাংলাদেশে তার পৈতৃক বা নিজের অর্জিত সম্পত্তি অটুট থাকবে। কিন্তু যে সব হিন্দু বৌদ্ধ-আদিবাসী তাদের মা-বোন-স্ত্রীর ইজ্জত বাঁচিয়ে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে ভারতে চলে এসেছে, চিরদিনের জন্য তাদের সম্পত্তি হারাতে হবে, হোক না সে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাথী চিত্তরঞ্জন সুতারের কোনো বংশধর। কিংবা ত্রৈলোক্য মহারাজ বা ইলা মিত্রের কোনো আপনজন। বর্তমানে যে সব হিন্দু বাংলাদেশে আছে, তাদের হারানো সম্পত্তি ফিরে পেতে হলে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক। এই 'স্থায়ী নাগরিক প্রমাণ করা' যে কত কঠিন কাজ তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবেন না।

আমাদের বিশ্বাস, ভারতের হিন্দু রাজনীতিবিদ এবং সাধুসন্তরা যদি অন্তত ১০০ বছর আগে থেকেও কোরান-হদিস পড়তেন, 'তাহলে ১৯৪৭-এর দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যালঘু বিনিময় হত, উদ্বাস্তু সমস্যার উদ্ভব হত না এবং বর্তমান জঙ্গিপনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারত না। তাই সকল হিন্দুকে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি পড়ার জন্য বিনীত অনুরোধ রাখছি।

* মাওলানা মওদূদীর 'তরজমা-এ কুরআন মজীদ' (১৯৯০);
* এম. এম. পিকথল অনূদিত 'দি মিনিংস অব গ্লোরিয়াস কোরান' (১৯৯১);
* টি. এইচ. হিউজের 'ডিকস্নারী অব ইসলাম' (১৯৯৯);
* রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ধর্মশাস্ত্রবিদ ডঃ আম্বেদকরের 'পাকিস্তান অব দি পার্টিশন অব ইণ্ডিয়া' (১৯৯০);
* শ্রীদেবজ্যোতি রায়ের 'ইসলাম ও বিশ্বশান্তি' (২০১১), 'কেন উদ্বাস্তু হতে হল' (৩য় সংস্করণ), 'মুসলিম রাজনীতি এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের পদত্যাগ' (২০০৮) এবং 'শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ কথিত মহাত্মা মহম্মদ ও তাঁর উপদেশ' (২য় সংস্কর)।

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদি এক নির্বাচনী জনসভায় বলেছিলেন ১৬ই মে'র পর বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমান ভোট ভিখারী দলগুলির নেতারা রে-রে করে আসরে নেমে পড়েছে। তৃণমূল নেত্রী রণং দেহি মূর্তি ধারণপূর্বক নরেন্দ্র মোদিকে কোমরে রশি দিয়ে জেলে পোরার হুমকি দিয়েছেন।

মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের মানবিকতা এবং অনুকম্পা দেখাতে গিয়ে আরাকান নামক একটি বৌদ্ধ রাজ্য কীভাবে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তার বিবরণ দিচ্ছি। এখানে উল্লেখ্য যে দিল্লির জনৈক আইনজীবী কেতন দত্ত কর্তৃক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের এদেশ থেকে বিতাড়নের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মামলা দায়ের করার পর দিল্লি হাইকোর্ট বার বার তীব্র ভর্ৎসনা করার পরও দিল্লির কংগ্রেস সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার নানা অজুহাতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ-কারীদের বিতাড়নের কোন ব্যবস্থাই করেনি। বরং তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল বলেন, মানবিকতার কারণে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ানো সম্ভব নয়। (আঃ বাঃ পত্রিকা ১৭.৫.২০০৫) এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ভারত সরকারের এক গোপন রিপোর্টে প্রকাশ দিল্লির ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্র এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমবঙ্গের ২৫টি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নির্ভর করে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের দ্বারা (বর্তমান সম্পাদকীয় ১০.৮.২০০৮)। অতএব সহৃদয় পাঠক/পাঠিকাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে কেন মমতা ব্যানার্জি, বিমান বসু এবং অধীর চৌধুরীরা নরেন্দ্র মোদির উপর খাপ্পা হবেন না।

বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আরাকান রাজ্য মায়ানমারের অন্তর্গত একটি রাজ্য। এই রাজ্যের রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। এখানে তারাই প্রথম বৌদ্ধমূর্তি এবং প্যাগোডা স্থাপন করেন। আরাকানে প্রথম মুসলিম বসতি স্থাপিত হয় চন্দ্ররাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মহৎইঙ্গ চন্দ্রের রাজত্বকালে। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস বাজোয়াং সূত্রে জানা যায় রাজা মহৎইঙ্গ চন্দ্রের (৭৮৮-৮১০) রাজত্বের শেষদিকে আরাকান নিকটবর্তী রামরীদ্বীপে আরব জলদস্যুদের একটি বাণিজ্য জাহাজ ডুবে যায়। তাতে অধিকাংশ জলদস্যু জলে ডুবে মারা যায়। যে ক'জন জীবিত ছিল তারা আরাকানে এসে উপস্থিত হয়। রাজার সৈন্য সামন্তরা তাদেরকে বন্দী করে রাজদরবারে উপস্থিত করলে রাজা তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে স্বীয় রাজ্যে বসবাসের অনুমতি দেন। রাজার অনুমতিপ্রাপ্ত এই আরব জলদস্যুরাই আরাকানের বসতি স্থাপনকারী প্রথম মুসলিম জনগোষ্ঠী। পরবর্তীকালে তারা স্থানীয় রমণীদেরকে বিবাহ করে আরাকানে ইসলাম প্রচার আরম্ভ করে। এরপর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরাকানে অভাবনীয়ভাবে মুসলিম অত্যাচারীদের দ্বারা নারী ধর্ষণ, নারী অপহরণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরীকরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের চাপে এবং অকথ্য অত্যাচারের ফলে আরাকান-রাজারা নিজেদের বৌদ্ধ নামের পাশাপাশি মুসলমান নামও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মুদ্রার একপিঠে বৌদ্ধ নাম ও পদবী অপর পিঠে আরবীতে মুসলিম নাম উপাধি ও

কলেমা উৎকীর্ণ করার প্রথা চালু করতে বাধ্য হয়। ১৪৩০ খ্রিষ্টাব্দে আরাকানের লিঙ্গায়েত বংশের শেষ রাজা মিনসুরাম ওরফে নর মিখলা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সুলেমান শাহ নাম গ্রহণ করে লেপ্র নদীর তীরে রাজধানী স্থাপন করে একটি বৃহদাকার মসজিদ নির্মাণ করেন যা সান্দিকা মসজিদ নামে বিখ্যাত।

অতএব দেখা যাচ্ছে মাত্র কয়েকজন মুসলমান জলদস্যুকে মানবিকতার কারণে আশ্রয় দিয়ে কিভাবে একটা বৌদ্ধ রাজ্য মুসলমানদের পদানত হয়েছে। এইসব দেখেও ভারতের মুসলিম ভোট ভিখারী রাজনৈতিক দলগুলি যদি শিক্ষা গ্রহণ না করে তবে অদূর ভবিষ্যতে ভারত যে একটি মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই।

এবার যে সব সেক্যুলার নেতারা ওপার বাংলা থেকে মুসলমানের হাতে মার খেয়ে এপারে এসে মহা সুখে সেক্যুলার রাজত্ব কায়েম করে রাজত্ব করছেন তাদের আত্মীয়-স্বজন ওপার বাংলায় কেমন আছেন তার বিবরণ দিচ্ছি যা ওখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

(১) বাংলাদেশের সাহিত্যিক, চিত্র পরিচালক এবং Weekly Blitz পত্রিকার সম্পাদক সালাউদ্দিন শোয়েব চৌধুরী গত ১২ জানুয়ারি ওয়াশিংটন বাংলা রেডিওতে এক খোলামেলা সাক্ষাৎকারে বলেন, ২০০৮ সালে বাংলাদেশে সেক্যুলার সরকার ক্ষমতায় এলেও বাংলাদেশের অধিকাংশ অবস্থার বাস্তবিক কোনো পরিবর্তন আসেনি, বাংলাদেশে প্রত্যেক বছর প্রায় ১৬ হাজার হিন্দু মহিলা অপহৃতা হয় এবং তারা বাধ্য হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ২০১১-তে এসেও এই সংখ্যা কমেনি মোটেও (তথ্য আমাদের দেশ ১৯.৩.২০১১, ঢাকা)।

(২) মে, ২০০২ বাঁশখালিতে এক মাসে ৫০০ নারী ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা ঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখার একটি লিগ্যাল এইড টিম সরেজমিনে বাঁশখালি ঘুরে এসে নারী নির্যাতনের এক ভয়ঙ্কর চিত্র তুলে ধরেন চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে। তাঁদের মতে বাঁশখালি এখন সংখ্যালঘু তরুণী গৃহবধুদের জন্য এক বিপজ্জনক জনপদে পরিণত হয়েছে। সেখানের একটি গ্রামের ২৫০টি হিন্দু পরিবারের এখন ৫০ বছরের নীচে কোন মহিলাই নেই। পান গ্রামে ১৪ মে এক রাতে ১৪ জন নারী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এইদিন তিন সন্তানের জননী ৬২ বছরের এক মহিলা দুর্বৃত্তদের কাছে কাকুতি-মিনতি করেও রেহাই পাননি। ৮ মে আদিত্য আশ্রমে ঢুকে সন্ত্রাসীরা নির্যাতন করেছে এক সেবিকা ও তার মেয়েসহ ৪ জনকে। এভাবে একমাসে বাঁশখালিতে বিভিন্ন এলাকায় ধর্ষিতা ও লাঞ্ছিতা হয়েছেন ৫০০ জন নারী। দুর্বৃত্তেরা ধর্ষণের পাশাপাশি হুমকি দিয়ে বলেছেন, হিন্দুদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ দেশে কোন "মালাউন" থাকতে পারবে

না। পরিষদ নেত্রী নূরজাহান খান, রেখা চৌধুরী, শীলা মোমেন, পুরী আসমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সংবাদ সম্মেলনে ধর্ষিতা কয়েকজনের ছিন্নভিন্ন কাপড় চোপড় দেখানো হয় (সূত্র : ভোরের কাগজ ২৯.৫.২০০২ ঢাকা)।

(৩) বাংলাদেশের জনৈক অধ্যাপকের লেখা 'একটি অমানবিক উৎসব' প্রবন্ধের কিছু অংশ। আমাদের গ্রামের জমিদার ও বাবার বন্ধু হরিশ্চন্দ্র গুহ কয়েকদিন আগে দড়াটানার ওপারে বাসাবাড়ির মাওলানা সাহেবকে আনিয়ে পাড়াসহ সপরিবারে কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছে এবং সমস্ত পুরুষ একযোগে খৎনা (যৌনাঙ্গের ত্বকচ্ছেদ) দিয়েছেন। গ্রামে সমস্ত মুসলমান চাঁদা তুলে গরু মেরে গণভোজ দিয়েছে। স্থান কামারডাঙ্গা, সহযোগিতায় গ্রামের রাজাকার দলভুক্ত তরুণ মুসলমান যুব সমাজের নেতৃত্বে মাওলানা হুজুরের দল। হিন্দুরা যে পুরুষাঙ্গের মাথা কেটে খৎনা দিয়ে কলমা পড়ে খাঁটি মুসলমান হয়েছে সেটা প্রমাণ করার জন্য এটি প্রকাশ্য প্রাথমিক অনুষ্ঠান। গর্ত খুঁড়ে ইট পাতিয়ে বিশাল ডেগ বসানো হয়েছে, নিচে গনগনে আগুন, ডেগের মধ্যে লম্বা খুন্তি দিয়ে মাংস ওলটপালট করছে টুপি মাথায় বাবুর্চি, প্রফুল্ল নাপিত, বাঙ্কা জগা পাটনি, শরদিন্দু দেবনাথ, শুভ্রাংশু দেবনাথ, শিশির দেবনাথ মিস্ত্রিরেরা। সবাই টুপি মাথায় লুঙ্গি পরে হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমাকে দেখে লুঙ্গির খুট বাম হাতে উঁচু করে তুলে ধরে ডান হাতে সালামের মুদ্রা এঁকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কষ্টের দেঁতো হাসি হেসে আপ্যায়ন করতে এগিয়ে আসে। ঘা এখনো টাটকা রয়ে গেছে। শুকিয়ে যায়নি। (তথ্যসূত্র : পরিকথা অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৫)।

দেশ যখন ভাগ হয় তখন পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম এম এল এ'র সংখ্যা ছিল ৬ জন। ২০১১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৬৯ জন। মুসলিমদের একজোট করতে একই মঞ্চে সিপিএম ও তৃণমূল মুসলিম এম.এল.এ-রা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আড়ালে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার রেজ্জাক মোল্লা এবং টি.এম.সি'র বিধায়ক এম. নুরুজ্জখান বিধায়ক দেগঙ্গা যথাক্রমে সভাপতি ও সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডাউন ট্রডন অ্যাণ্ড মুসলিমস্ (দলিত মুসলিম ঐক্য) দপ্তরের ঠিকানা—১১, তিলজলা লেন, কলকাতা। তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন অসমের ১৮ এম.এল.এ নেতা বদরুদ্দীন আজমল। মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমানে কাজ শুরু করছে, ২০১৬ সালের ভোটে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ রাজ-উচ্ছেদের প্রযুক্তি চলছে। অতএব সাধু সাবধান।

ধর্মনিরপেক্ষতা কি বিপন্ন? একটি মৌলিক প্রশ্ন

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের একটি গণ্ডগ্রাম দাদরিতে জনৈক মহঃ আখলাককে গোঁমাংস খাওয়ার অপরাধে কতিপয় হিন্দু যুবক পিটিয়ে হত্যা করার ফলে ভারতব্যাপী যে সুনামীর সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখার অবতারণা। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ১০ জনকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, মওলানা মুলায়েম সিং পরিচালিত উত্তরপ্রদেশ সরকার আখলাকের পরিবারকে ৪৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা এবং পরিবারের একজনকে সরকারি চাকুরি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। এই ঘটনার পরে ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে চুনোপুঁটি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতারা যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন বলে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছে তাতে মনে হয় ভারত দেশটা হিন্দু তালিবানি দেশে পরিণত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার ৬৮ বছরের মধ্যে ৬ বছর বাজপেয়ী সরকারের সময় ছাড়া ৬২ বছর চলছিল ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলিম স্বার্থ রক্ষাকারী শাসন ব্যবস্থা।

গান্ধী নেহেরু কুচক্রীরা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে জনবিনিময় না করে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান মেনে নিয়ে, বাকি অংশ ভারতকে হিন্দু মুসলমানের যৌথ সম্পত্তি বলে ঘোষণা করলেন। এদের শাসনকালে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পদে পদে মুসলমান অত্যাচারের শিকার হয়েছে। যার ফলশ্রুতি হিসেবে বর্তমান ঘটনাবলীর উদ্ভব। এখানে সামান্য কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করছি। যাতে প্রমাণিত হয় সরকারের মুসলিম তোষণের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যাওয়ার ফলে দাদরির ঘটনা বিক্ষেপের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হিন্দুদের ক্ষোভগুলির মধ্যে সামান্য কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি। দেশ যখন স্বাধীন হয় তখন সরকার ঘোষণা করেন মন্দির মসজিদ যেখানে যে অবস্থায় আছে সেখানেই সেই অবস্থায় থাকবে। অথচ কাশ্মীরে যত হিন্দু মন্দির ছিল সমস্তই মুসলমানরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে। যার চিহ্নমাত্র আজর আর নেই। ৪ লক্ষ হিন্দুকে মুসলমানরা কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত করল, এখানে সাহিত্যিকরা চুপ, কাশ্মীরে মসজিদে বসে উগ্রপন্থীরা সেনাবাহিনীর দিকে গুলি ছুড়ে তাদেরকে হত্যা করল কিন্তু সেনাদের তরফে মসজিদের দিকে গুলি ছোড়ার আদেশ নেই, কারণ মসজিদে বুলেটের আঘাত লাগলে মুসলমানরা মনে আঘাত পাবে। সেনারা মসজিদে জল, বিদ্যুৎ এবং খাবার সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে আদেশ

আসে যদিও তারা উগ্রপন্থী, তবুও তারা মানুষ। অতএব জল, বিদ্যুৎ, খাবার সরবরাহ বন্ধ করা যাবে না। তাহলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে। খাবার নিয়ে মসজিদের ভেতর গেলে যদি সেনাকর্মীদের পণবন্দী করে তখন সিদ্ধান্ত হল সেনাবাহিনীর বুলেট প্রুফ ক্রেন দিয়ে বড় বড় ডেকচি করে বিরিয়ানি এবং গোস্ত সেই মসজিদে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। পক্ষান্তরে অমৃতসরে স্বর্ণমন্দির আক্রমণ করে যখন গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। ইন্দিরার মৃত্যুর পর দিল্লির রাজপথে ৩০০০ শিখের মাথায় পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল তখন বিবেচনা করা হল না শিখদের মনে আঘাত লাগার কথা। কারণ শিখ ভোট থেকে মুসলমানদের ভোট অনেক মূল্যবান। হিন্দুরা দুটো বিয়ে করলে জেল জরিমানা এবং সরকারি চাকুরি হলে পদচ্যুতি। তারা বিচার করে এই শাস্তি দিতে পারবেন ৪ বিবির মালিক মুসলমান বিচারপতি। মুসলমান তালাক দিলে মহিলাদের ভরণ পোষণের ভার তার আত্মীয় স্বজন না নিলে তার ভরণ পোষণের টাকা যোগাবে ভারত সরকার। পক্ষান্তরে হিন্দু বিধবারা পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন এবং তিরুপতিতে ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করবে।

কোন হিন্দু যুবক মুসলমান মেয়ে বিয়ে করলে মুসলমানরা তাকে হত্যা করতে পারবে কোন শাস্তি হবে না। উদাহরণ মুর্শিদাবাদে শৈলেন্দ্রপ্রসাদ (৩২), মনোয়ারা খাতুন (২৫)-কে বিয়ে করার অপরাধে মুসলমানরা শৈলেন্দ্রপ্রসাদকে ঠাণ্ডা মাথায় জবাই করে হত্যা করে। বারাসতে অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বেহেনা সুলতানাকে বিয়ে করার অপরাধে মুসলমানরা কেরোসিন ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা চেষ্টা করে। তার শরীর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। সে পঙ্গু হয়ে প্রাণে বেঁচে আছে। বোলপুরের চায়না বিবির সাথে প্রেম ছিল কেশব মাহাতোর, সেই অপরাধে চায়না বিবির আত্মীয়দের হাতে খুন হন কেশব মাহাতো। শান্তিপুরে চঞ্চল সাধুখাঁ ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন লিয়াকৎ আলীর কন্যাকে। সেই অপরাধে লিয়াকৎ দলবল নিয়ে এসে চঞ্চলের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং জামাই মেয়েকে না পেয়ে চঞ্চলের পিতা রাধানাথ সাধুখাঁকে হত্যা করে। এই ঘটনাগুলির একটারও বিচার হয়নি পক্ষান্তরে কোন হিন্দু পুরুষ যদি মুসলমান মেয়ে বিয়ে করতে চায় তবে তাকে ধর্মান্তরিত হতে হবে। উদাহরণ আমাদের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। বগুড়ার আমেদ আলীর তালাক প্রাপ্ত সুরাইয়া বেগমকে নিকাহ করার জন্য ইসলাম কবুল করে ইফতিয়ার গনী নাম ধারণ করেন। সঙ্গীত শিল্পী কমল দাশগুপ্ত ফিরোজা বেগমকে নিকাহ করার জন্য ইসলাম কবুল করে কামালউদ্দীন নাম ধারণ করেন। টি.এম.সি'র লোকসভা সদস্য সুমন চট্টোপাধ্যায় সাবিনা ইয়াসমিনকে নিকাহ করার জন্য ইসলাম কবুল করে কবীর সুমন নাম ধারণ করেন। ভারতের প্রত্যেক

মুসলমান নেতার অন্তত একজন করে হিন্দু স্ত্রী আছে। এক সময়ের কংগ্রেস এম.পি. রাজীব গান্ধীর বন্ধু এম. জে. আকবর গোধরা কাণ্ডের সময় যিনি নরেন্দ্র মোদিকে জল্লাদ বলে গালি দিতেও পিছপা হননি। তিনি বিজেপি'তে যোগ দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীর নাম মল্লিকা (হিন্দু কন্যা) বিজেপি নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভি তার স্ত্রীর নাম সীমা (হিন্দু কন্যা)। বিজেপি নেতা শাহনাওয়াজ হোসেন স্ত্রীর নাম রেণু (হিন্দু কন্যা) একটিও উদাহরণ দেখতে পাবেন না হিন্দু নেতার মুসলমান স্ত্রী আছে। সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকার ব্যয় করছে। অথচ সংস্কৃত শিক্ষার টোলগুলির জন্য কোন টাকা বরাদ্দ করে না, রমজানের মাসে হিন্দু নেতারা নির্লজ্জ বেহায়ার মত মাথায় টুপি পরে, হিজাব পরে ইফ্‌তার পার্টিতে গোমাংসের শিক্‌কাবাব খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে বাড়ি ফেরেন। অথচ একটাও উদাহরণ নেই যে মুসলমান নেতারা পূজায় এসে অঞ্জলি দিচ্ছেন অথবা প্রসাদ খেয়েছেন।

সারা ভারতে তিন লক্ষ ইমাম ভারত সরকারের থেকে মাইনে পাচ্ছেন, অথচ দুস্থ পুরোহিতদের মাইনে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে বর্তমান পত্রিকার ২০.৯.২০০৪-এর একটা সংবাদ উল্লেখ করছি। 'পুরোহিত মাণিক গাঙ্গুলির তিন কন্যা এক সাথে বিষ খেলেন, তার মধ্যে ময়না (২০) মৃত, দু'জন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে। দরিদ্র পুরোহিত মেয়েদের বিবাহের টাকা যোগাড় করতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মুসলমান তোষণ নিয়ে একটা মহাভারত তৈরি করা যায়। মুসলমানরা মন্দিরের সামনে দিয়ে তরোয়াল, লাঠি, ছোরা নিয়ে মহরমের মিছিল করতে পারবে কিন্তু হিন্দুরা মসজিদের সামনে দিয়ে প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা নিয়ে যেতে পারবে না। মুসলমানরা জনসংখ্যা অনুসারে চাকুরিতে সংরক্ষণ চাইছে অথচ জনসংখ্যা অনুসারে তারা আয়কর কমার্শিয়াল কর দেয় কি? তারা এদেশে থাকবে অথচ দেশের আপদে বিপদে তারা মোটেই এগিয়ে আসে না। উদাহরণ ২০১৩ সালে উত্তরাখণ্ডে যখন ভয়ানক বন্যায় অসংখ্য প্রাণহানি এবং বাড়িঘর ধ্বংস হয় তখন স্টেটসম্যান পত্রিকা একটি রিলিফ ফাণ্ড খুলে পাঠকদের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। পত্রিকার তালিকা অনুসারে ৬৭৯ জন দাতার মধ্যে মাত্র দুইজন মুসলমান টাকা পাঠান তার মধ্যে একজন ডঃ মসিউর রহমান ১০১০ টাকা অন্যজন মঃ রমিজ আলম ২৫০ টাকা। এদেশে বসবাসকারী মুসলমানরা পাকিস্তানকেই তাদের রক্ষাকর্তা বলে মনে করেন। বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলছিল তখন এখানকার সমস্ত মুসলমান নেতারা দলমত নির্বিশেষে কলকাতাস্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের সঙ্গে দেখা করে, আচ্ছেলাম ওয়ালায়কুম বলে সম্বোধন করে তাদেরকে পাকিস্তান ভাঙ্গার

চক্রান্ত থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানায়। এখানকার মুসলমানরা বাংলাদেশ শরণার্থীদের জন্য কোন সাহায্য দিতে এগিয়ে আসেনি।

এই ভণ্ড সেক্যুলারবাদীরা আর একটা অভিযোগ করছে 'ঘরেওয়াপসী'র নামে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। এখানে দুটো বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করছি—

(১) আমি অহল্যা মণ্ডল মৃত প্রিয়রঞ্জন মণ্ডলের স্ত্রী মথুরাপুর থানার অধীনে তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা আমার তিন পুত্র ও তিন কন্যা আমরা সবাই মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হইলাম। ডায়মণ্ডহারবার কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে এফিডেভিট বলে জারিনা বেওয়া থেকে অহল্যা মণ্ডল, জয়নাল গাজী হইতে বাপি মণ্ডল, নীলিমা খাতুন হইতে নীলিমা মণ্ডল, ফজলু গাজী হইতে বিজয় মণ্ডল, ফাজিলা খাতুন হইতে প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, সাবির গাজী হইতে সুজয় মণ্ডল, ফিরোজা খাতুন হইতে অনু মণ্ডল (দাস) নামে পরিচিত হইলাম। (বিজ্ঞাপনটি বর্তমান পত্রিকার ২৭.২.২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়)। (২) আর একটি বিজ্ঞাপন—আমি সুপ্রভাত মোল্লা স্ত্রী মায়া মোল্লা, পুত্র রথীন মোল্লা সকলে ৫.৬.২০১৫ তারিখে ডায়মণ্ডহারবার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিটে আমি সুপ্রভাত মণ্ডল, স্ত্রী মায়া মণ্ডল, পুত্র রথীন মণ্ডল হইলাম। (বিজ্ঞাপনটি বর্তমান পত্রিকার ১১.৬.২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে)।

মুসলমান হওয়া খুবই সহজ, একবার খাঁচায় পুরতে পারলে তার থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। উদাহরণ ডঃ কমলা দাসের ছদ্মনাম মাধবী কুট্টী মালেয়ালী সাহিত্যের উজ্জ্বল তারকা। কলকাতায় থাকাকালীন ইসলাম কবুল করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তার মোহভঙ্গ হয়, স্বাধীনভাবে চলাফেরা নিষিদ্ধ, বোরখা পরে বাইরে বের হওয়া তার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। তসলিমার কাছে তিনি স্বীকার করেছেন ইসলাম কবুল করা তার ভুল হয়েছে, কিন্তু এখন ফেরার কোন পথ নেই। ইসলাম ত্যাগ করলেই প্রাণনাশের ভয়।

ভণ্ড সেক্যুলার বাদীদেরকে জিজ্ঞেস করছি, নরেন্দ্র মোদি কি দিল্লি থেকে এসে উপরোক্ত দুই পরিবারকে ঘরওয়াপসী হতে প্ররোচিত করেছেন? তবে এটা সত্যি যে নরেন্দ্র মোদি বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার ফলে ইসলাম ত্যাগ করার অজুহাতে হত্যার হাত থেকে তারা রক্ষা পেয়েছেন। কংগ্রেস আমল হলে ইসলাম ত্যাগ করার অজুহাতে হত্যা করেও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেত হত্যাকারী মুসলমানরা কারণ ইসলাম ধর্মে ধর্মত্যাগীদের হত্যা করার বিধান দেওয়া আছে।

ভণ্ড খেতাব ত্যাগী সেক্যুলারবাদীদেরকে আর একটা প্রশ্ন—কেরলে অধ্যাপক পি. কে. যোসেফ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এমন কিছু লেখেন যাতে মৌলবাদী

মুসলমানরা মনে করেন তাদের নবীকে অপমান করা হয়েছে। সেই অজুহাতে মৌলবাদী মুসলিমরা অধ্যাপক যোসেফের ডান হাতের কব্জি থেকে হাত কেটে নেয়। এই সময় কেরলে কিন্তু বাম শাসন, ইসলাম অবমাননার দায়ে অধ্যাপক যোসেফকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন তারা চুপ ছিলেন কেন?

ইউরোপে মুসলমান শরণার্থী

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

সম্প্রতি মুসলমান দুনিয়ার হালহকিকত সম্বন্ধে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁদের অবগতির জন্য জানাই রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্ট অনুসারে ২০১১ সাল থেকে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া ইস্তক ৬০ লক্ষাধিক মানুষ দেশ ছেড়েছেন। গত ৪ বছরে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ২.৫ লক্ষ মানুষ। আর চলতি বছর বিভিন্ন দেশ থেকে শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪.৫ লক্ষ। এর মধ্যে হাজার তিনেকের প্রাণ গিয়েছে ভূমধ্যসাগরের জলে ডুবে। এখনও সাগর পেরিয়ে ইউরোপে ঢুকতে অপেক্ষারত প্রায় ৮.৫ লক্ষ। রাষ্ট্রসঙ্ঘ আরও বলেছে, শরণার্থী তালিকায় ৫০ শতাংশই সিরিয়ার নাগরিক। যেখানে কট্টরপন্থী একটি ইসলামি সংস্থার অত্যাচারে এই বিরাট সংখ্যক লোক দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তারা যুবতীদের ধরে নিয়ে গিয়ে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করছে এবং বাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে। স্কুল কলেজ ধ্বংস করে দিচ্ছে। খ্রীষ্টপূর্ব বহু পুরাকীর্তি বিস্ফোরকের সাহায্যে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। যারা তাদের এইসব অপকর্মের বিরোধিতা করছে তাদের মুণ্ডচ্ছেদ করছে। এই পরিস্থিতিতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নিজের দেশ ছেড়ে ইউরোপীয় দেশগুলির দিকে ধাবিত হচ্ছে। জার্মান একটি ক্ষুদ্র দেশ ইতিমধ্যেই ৮ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এছাড়াও প্রতি বছর আরও ৫ লক্ষ করে শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। অথচ একটা আশ্চর্য ব্যাপার পৃথিবীতে ৫৬টি মুসলমান রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু এ ব্যাপারে একেবারে নির্লিপ্ত। ওইসব মুসলমান দেশ একটাও শরণার্থীকে তাদের দেশে আশ্রয় দিচ্ছে না। সে সৌদি আরব থেকে সমগ্র দুনিয়ায় ইসলাম রপ্তানি হয়, হজ উপলক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আগমনের ফলে বিশাল সংখ্যার অর্থ উপার্জন হয় তারাও এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। পক্ষান্তরে, সৌদি রাজপুত্ররা তাদের নিজস্ব বিমানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ দামের গাড়ি বহন করে নিয়ে গিয়ে লণ্ডনে ঈদের বাজার করতে ব্যস্ত। ওইসব গাড়িগুলি কোনোটা সোনার পাত দিয়ে মোড়া, আবার কোনোটা সোনার জলে রঙ করা। ওইসব গাড়ি যখন লণ্ডনের রাস্তায় দাঁড়ায় তখন সে দেশের চিত্রতারকা এবং ধনীর দুলালরা ওইসব গাড়িতে হাত বুলিয়ে তৃপ্ত হন। এইসব দেখে শুনে আমার মনে একটা চিন্তার উদ্রেক হয়েছে যা

নিম্নরূপ ঃ ইটালিয়ান দার্শনিক মেকিয়াভেলির একটা থিওরি হলো—"বর্তমান যুগে যুদ্ধ করে অন্য দেশ দখল করে রাখা সম্ভব নয়, তাই কোনো দেশ দখল করতে হলে যত বেশি সংখ্যক পারা যায় সে দেশে নিজেদের লোক চালান করে দেওয়া" এই কথা যদি সত্য হয় তবে মুসলমানরা সমগ্র ইউরোপকে ইসলামের সুশীতল ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মুসলমানরা পরিবার পরিকল্পনায় বিশ্বাস করে না। যে সব মহিলারা ওইসব ইউরোপীয় দেশে যাবেন তাদের গর্ভজাত সন্তানরা জন্মসূত্রে সে দেশের নাগরিক হয়ে যাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে ওই দেশ একটি মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের মানবিকতা এবং অনুকম্পা দেখাতে গিয়ে আরাকান নামক একটি বৌদ্ধ রাজ্য কীভাবে মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি। বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আরাকান মায়ানমারের অন্তর্গত একটি রাজ্য। এই রাজ্যের রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এখানে তারাই প্রথম বৌদ্ধমূর্তি এবং প্যাগোডা স্থাপন করেন। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস বাজেয়াং সূত্রে জানা যায়, রাজা মহৎঈঙ্গ চন্দ্রের (৭৮৮-৮১০) রাজত্বের শেষদিকে আরাকান নিকটবর্তী রামরী দ্বীপের নিকটে আরব জলদস্যুদের একটি বাণিজ্য জাহাজ ডুবে যায়। তাতে অধিকাংশ জলদস্যু জলে ডুবে মারা যায়। যে ক'জন জীবিত ছিল তারা আরাকানে এসে উপস্থিত হয়। রাজারা সৈন্যসামন্তরা তাদের বন্দী করে রাজদরবারে উপস্থিত করলে রাজা তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে স্বীয় রাজ্যে বসবাসের অনুমতি দেন। রাজার অনুমতিপ্রাপ্ত এই আরব জলদস্যুরাই আরাকানে বসতি স্থাপনকারী প্রথম মুসলমান জনগোষ্ঠী, পরবর্তীকালে তারা স্থানীয় রমণীদের বিবাহ করে আরাকানে ইসলাম চাষাবাদ আরম্ভ করে। এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরাকানে অভাবনীয়ভাবে মুসলমান অনুপ্রবেশ পরিলক্ষিত হয়।। ধীরে ধীরে আরাকানে মুসলমান অত্যাচারীদের দ্বারা নারী অপহরণ, ধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুসলমানদের চাপে আরাকান রাজারা নিজেদের বৌদ্ধনামের পাশাপাশি মুসলমান নামও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের লিঙ্গায়েত বংশের শেষ রাজা মিনসুরাম ওরফে পর মিখলা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে সুলেমান শাহ নাম গ্রহণ করে লেপ্র নদীর তীরে রাজধানী স্থাপন করে একটি বৃহদাকার মসজিদ নির্মাণ করেন যা সান্দিকা মসজিদ নামে বিখ্যাত। এসব দেখেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি তারাও মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত হবে এবং শরিয়তি সংবিধান মানতে বাধ্য হবে। সমগ্র ইউরোপের ছোট ছোট দেশগুলিতেও মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে সেখানকার আদি বাসিন্দারা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে। যে ৫৬টি মুসলমান দেশ আছে তারা একটাও মুসলমানকে স্থান দিচ্ছে না—এটা একটা ষড়যন্ত্র। এমন ঘটনার শিকার আমরা হয়েছি। আর তা যাতে না ঘটে, তার জন্য জনমত গঠন করা দরকার।

লেখক পরিচিতি

স্বামী বিবেকানন্দ, আব্রাহাম লিঙ্কন এবং ডেল কার্নেগীর একনিষ্ঠ ভক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্ত অবিভক্ত ভারতের নোয়াখালি জেলার কালিকাপুর গ্রামে বাংলা ১৩৩৮ সালের ১৩ই বৈশাখ, দিবা ৯টা জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺হেমেন্দ্রলাল দত্ত হাইস্কুলের শিক্ষক, মাতা ৺চারুলতা দত্ত গৃহবধূ। পরবর্তীকালে ঢাকা শহরের উয়ারীর বাসিন্দা। কর্মজীবনে ভারতীয় জীবনবীমা নিগম-এর অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়ার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের ডাইরেক্টর অ্যাকশন ডে এবং ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা শহর তথা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-নিধন যজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী। ১৯৫০ সালে হিন্দু-নিধনের শিকার হয়ে একবস্ত্রে ঢাকা শহর ত্যাগ করে কলকাতায় আগমন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালি জেলায় হিন্দু-নিধনের পর সেখানে স্বেচ্ছাসেবকের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ঢাকা ও নোয়াখালির গ্রামাঞ্চলে বহু বর্বরোচিত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। লেখকের বহু লেখা দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

চাকুরি জীবনে কর্মদক্ষতার জন্য ভারতীয় জীবনবীমা নিগম লেখককে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। এছাড়াও ২০০৩ সালে লেখকের কয়েকটা প্রবন্ধ দিল্লি থেকে প্রকাশিত 'অভয়ভারত' (ইংরাজি এবং হিন্দি) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মতামত গ্রহণ করার পর তার লেখাগুলি প্রথম স্থান অধিকার করে। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাকে প্রথম পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় যার অর্থমূল্য ৫০,০০০ টাকা। কিন্তু তিনি সেই অর্থ গ্রহণ করেননি।

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ই ডিসেম্বর, ২০১৫

প্রকাশক ঃ
রবীন্দ্রনাথ দত্ত, মোবাইল ঃ ৯৪৩৩০৪৭১৪৪

সহায়তা মূল্য ঃ ২০ টাকা মাত্র